রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ

নূর হোসেন মজিদী

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ

নূর হোসেন মজিদী

Rasulullahr (Sallallahu `alaihi wa aalih) Ahl-e-Bayt O Bibigan- Household and Wives of the Holy Prophet (S.A.W.A) by Nur Hosain Majidi written in Bengali Language. May 2015

এই বইটি আল হাসানাইন (আ.) ওয়েব সাইট কর্তৃক আপলোড করা হয়েছে ।

http://alhassanain.org/bengali

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহীম

"আহলে বাইত" কোরআন মজীদের একটি বিশেষ পরিভাষা, তাই এর তাৎপর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আমাদের সকলের জন্যই অপরিহার্য। এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই।

অবশ্য প্রকৃত বিচারে এ পরিভাষার তাৎপর্যে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ কাল যাবত এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোনো মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না এবং পরবর্তীকালে ভিন্নমতের উদ্ভব হলেও তা ছিলো একান্তই বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু বিগত বিংশ শতাব্দী থেকে এ বিষয়ে কোনো কোনো মহল কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে ভিন্নমত প্রচার করতে দেখা যায়।

আভিধানিক অর্থে اهل بيت (আহলে বাইত) মানে 'গৃহবাসী' অর্থাৎ কোনো গৃহে বসবাসকারীগণ তথা কোনো গৃহকর্তার পরিবারের সদস্যবর্গ। এতে মূলতঃ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তান- সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যে সাবালেগ পুত্রকন্যা বিয়েশাদী করে নিজস্ব ঘরসংসার ও পরিবারের অধিকারী হয়েছে তারা তাদের পিতার আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সাবালেগ পুত্র তার নিজ পরিবারের তথা তার নিজস্ব আহলে বাইত- এর কর্তা, আর সাবালেগ বিবাহিতা কন্যা স্বীয় স্বামীর পরিবারের তথা স্বামীর আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু কোরআন মজীদে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত বলতে এর আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয় নি, বরং কোরআন মজীদে ব্যবহৃত আরো অনেক পরিভাষার ন্যায় এটি একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মত অনুযায়ী আহলে বাইত বলতে হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) এবং হযরত আলী,

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- কে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য এর সম্প্রসারিত তাৎপর্য অনুযায়ী হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর বংশে আগত আল্লাহর খাছ বান্দাহগণ তথা নয় জন ইমামও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিশেষ অর্থে উপরোক্ত চার জন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব যে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত এটা বিতর্কাতীত বিষয়।

[বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ এ চার পবিত্র ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখের পর ছাহাবী বিবেচনায় "রাযীয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু/ 'আনহা/ 'আনহুম" এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মহান ইমামগণের নামের পরে (রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহ্) বলা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদে আহলে বাইতের যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে এবং আমরা নামাযে যেভাবে আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর প্রতি দরূদ প্রেরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন করে থাকি সে প্রেক্ষিতে আল্লাহর দ্বীনে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে আমরা তাঁদের নামোল্লেখের পরে তাঁদের প্রতি সালাম প্রেরণকে সঙ্গত, বরং যরূরী বলে মনে করি।]

কিন্তু বিগত বিংশ শতাব্দীতে কোনো কোনো মুফাসসির ও আলেমের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে বিতর্কিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণও আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত, আবার কেউ কেউ এমনও দাবী করেছেন যে, কেবল তাঁরাই আহলে বাইত, যদিও এ উভয় ধরনের দাবীর কোনোটির পক্ষেই কোনো অকাট্য দলীল নেই। এমনকি বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে এসে নব- উদ্ভূত কোনো কোনো চন্তিক ধারা থেকে এমন দাবীও করতে দেখা গেছে যে, হযরত যায় , 'আম্মা , সালমান্, আবূ যা (রাযীয়াল্লাহু তা ' আলা 'আনহুম্) প্রমুখ কতক ছাহাবীও আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, উক্ত মহান ছাহাবীগণের আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ- তিতিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হওয়ার বিষয়টি অনস্বীকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বলে যে দাবী করা হয়েছে তার সপক্ষে কোনো ধরনের অকাট্য দলীল বর্তমান নেই।

আহলে বাইত- এর এ সব নতুন সংজ্ঞা অবশ্য সাধারণভাবে মুসলিম জনগণের মধ্যে গ্রহণীয় হয় নি। কিন্তু ইসলামের সঠিক জ্ঞান বিহীন কিছু লোক এগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তা অন্যদের মধ্যে ছড়াচ্ছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, সম্প্রতি (২০১২) একটি

বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ডি.ফিল্.- শিক্ষার্থীকে অভিসন্দর্ভ লেখার জন্য 'আহলে বাইতের নারী সদস্যগণের শিক্ষাচর্চা, সমাজসেবা ও আদর্শ পরিবার গঠন' শীর্ষক বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিয়ে সে জন্য যে বিষয়পরিকল্পনা দেয়া হয় তাতে আহলে বাইত- এর সর্বসম্মত চারজন সদস্যের পাশাপাশি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ তাঁর আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ বিষয়ে বিভ্রান্তির নিরসন অপরিহার্য।

এ বিষয়ে বিভ্রান্তি নিরসন এ কারণেও অপরিহার্য যে, সকল মুসলমানই নামাযের শেষ বঠকে দরূদ পাঠ করে থাকে যা ব্যতিরেকে নামায সম্পূর্ণ ও ছহীহ্ হয় না এবং এ দরূদের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদ" বা (পাঠভেদে) "আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ"। আর এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, কোরআন মজীদের আয়াতে উল্লিখিত "আহলে বাইত" ও দরূদে উল্লিখিত "আলে মুহাম্মাদ" (ছ্বাঃ)- এর তাৎপর্য অভিন্ন। এমতাবস্থায় "আহলে বাইত" বা "আলে মুহাম্মাদ" (ছ্বাঃ) কারা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। কারণ, যেহেতু আমলকে নিয়্যত্ অনুযায়ী বিবেচনা করা হয় সেহেতু সঠিক ব্যক্তিদের "আহলে বাইত" বা "আলে মুহাম্মাদ" (ছ্বাঃ) গণ্য না করে দরূদ প্রেরণ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, বিশেষ করে নামায ছহীহ্ ও সম্পূর্ণ হবে না। তাই আমাদের এ আলোচনার অবতারণা।

এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, 'আক্বাএদী, ফিক্বহী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বিশেষে দ্বীনী বিষয়াদিতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্যেরও অন্যতম উৎস হচ্ছে ইসলামে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিতি ও তার বাস্তবায়ন না হওয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত মতভেদ নিরসনের পন্থার ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, অতীতে যারাই আহলে বাইতের ('আঃ), বিশেষ করে এ ধারার ইমামগণের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করেছেন এবং

তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধেই উমাইয়াহ্ ও 'আব্বাসী স্বরশাসকদের তাবেদার কিছু লোক "শিয়া", "রাফেযী" ইত্যাদি বলে অপবাদ দিয়েছে। এ অপবাদ থেকে এমনকি সুন্নী মাযহাবগুলোর কয়েক জন ইমামও রেহাই পান নি। এ ধরনের আত্মবিক্রিত লোকদের এ কর্মধারা তখন থেকে আজ তক্ অব্যাহত রয়েছে। এখনো যে কেউ আহলে বাইতের ('আঃ), বিশেষ করে এ ধারার ইমামগণের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করলে এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে তার ওপরই কতক লোক 'শিয়া' লক্বব্ লাগিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে। এরা কারো অকাট্য দলীল ভিত্তিক বক্তব্যের যথার্থতা অকাট্য দলীল দ্বারা খণ্ডন করতে না পেরে বক্তার বিরুদ্ধে 'শিয়া' হবার শ্লোগান তুলে জনগণের দৃষ্টিকে সত্য বক্তব্য থেকে ফিরিয়ে নিতে চায়। ইতিমধ্যে অত্র গ্রন্থকারের বিরুদ্ধেও কিছু লোক এ ধরনের আক্রমণ চালিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমি ইতিপূর্বে যেমন বিভিন্ন সময় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছি তেমনি এখানেও উল্লেখ করছি, আমি কোনো মাযহাবের অনুসরণ করা অপরিহার্য মনে করি না। আমি 'আক্বাএ ও তার শাখা- প্রশাখা এবং ফরয ও হারামের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় চার অকাট্য দলীল অনুসরণকে সঠিক বলে মনে করি- যে সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের মূল পাঠের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। এ চার অকাট্য দলীল ভিত্তিক কোনো কোনো উপসংহার যদি বিতর্কিত হিসেবে পরিগণিত 'আক্বাএদের কোনো শাখা বা কোনো ফরয বা হারামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মাযহাবের মতের সাথে মিলে যায় তো কেবল ঐ মিলের কারণেই তা পরিত্যাগ করতে হবে- এ নীতির প্রবক্তাদের এরূপ মতের সপক্ষে কোনো অকাট্য দলীল নেই। অন্যদিকে এ ধরনের মিলের মানে এ- ও নয় যে, ঐ মাযহাবের সব কিছুর সাথেই একমত হতে হবে।

বস্তুতঃ কোনো মাযহাব্ মানে কেবল চার অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত 'আক্বাএ ও তার কতক শাখা- প্রশাখা এবং ফরয ও হারামের আহকাম নয়, বরং একটি মাযহাব্ হচ্ছে ঐ মাযহাবের 'আক্বাএদের সকল শাখা- প্রশাখা এবং চার দলীল ভিত্তিক নয় ফরয ও হারাম বলে গণ্যকৃত এমন আহকাম, উছূলে ফিক্বাহ্ ও উছূলে হাদীছ সহ ফিক্বাহ্ শাস্ত্রের ও হাদীছ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার। আমি আবারো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছি যে, এ সব ক্ষেত্রে আমি কোনো মাযহাবের 'আক্বাএদের

একান্ত শাখা- প্রশাখা সমূহ,   বা তার গোটা ফিক্বাহ্ শাস্ত্র বা কোনো ধারার হাদীছগ্রন্থ্ সমূহের অন্ধ অনুসরণের পক্ষপাতী নই। সুতরাং এরপরও যদি কেউ আমার ওপর কোনো বিশেষ মাযহাবের লক্বব লাগাবার অপচেষ্টা করে তো তার সে কথাকে আমি পাগলের প্রলাপ বা ভণ্ড মতলববাযের মতলববাযী আবোলতাবোল ছাড়া আর কিছু বলে মনে করি না।

গ্রন্থ্টির কাজ গত মে মাসে (২০১৫) সমাপ্ত করার পর ইউনিকোডে রূপান্তরিত করে নোট আকারে ফেসবুকে প্রকাশ করেছিলাম। পরে এতে আরো কিছু বিষয় অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করি। তা আঞ্জাম দেয়ার ফলে বিশেষভাবে গ্রন্থ্টির দ্বিতীয় চতুর্থাংশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটে। এ কারণে এটি পুনরায় নতুন করে ফেসবুকে প্রদান করছি।

আমাদের এ আলোচনা আলোচ্য বিষয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে সক্ষম হলেই এর সার্থকতা। আল্লাহ্ তা'আলা এ পুস্তককে এর লেখক এবং এর প্রচারের সাথে জড়িত সকলের ও পাঠক-পাঠিকাদের পরকালীন মুক্তির পাথেয়রূপে গণ্য করুন। আমীন

বিনীত

নূর হোসেন মজিদী

রাসূলুল্লাহ্‌র (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ

আলোচনার মানদণ্ড

অত্র আলোচনার শুরুতে আমরা দ্বীনী বিষয়াদিতে আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রহণযোগ্য অকাট্য মানদণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। কারণ, আমরা যাতে সন্দেহাতীত উপসংহারে উপনীত হতে পারি সে লক্ষ্যে আমাদেরকে কেবল ঐ সব মানদণ্ডের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হবে যেগুলো অকাট্য এবং মাযহাব ও ফিরক্বাহ্‌ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য।

মাযহাব ও ফিরক্বাহ্‌ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনী বিষয়াদিতে আলোচনার ক্ষেত্রে যে সব মানদণ্ড অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছে 'আক্বল্‌ (বিচারবুদ্ধি), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতি হাদীছ ও ইজমা'এ উম্মাহ্‌।

সংক্ষেপে বলতে হয়, 'আক্বল্‌- কে এ কারণে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যে, তা সমস্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন মানদণ্ড ও জ্ঞানসূত্র- যার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে একজন অমুসলিম ইসলামের সত্যতায় উপনীত হয় ও তা গ্রহণ করে এবং কোরআন মজীদ সহ অন্য সমস্ত জ্ঞানসূত্র থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে 'আক্বল্‌ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই কোরআন মজীদে 'আক্বল্‌- এর প্রয়োগের ওপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

[আমি আমার "জ্ঞানতত্ত্ব ও ইসলাম" এবং "জীবন জিজ্ঞাসা" গ্রন্থ দু'টিতে 'আক্বলের সর্বজনীন মানদণ্ড ও জ্ঞানসূত্র হওয়া সম্পর্কে এবং কোরআন মজীদে এর ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, বিশেষ করে 'আক্বলী মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইসলামী 'আক্বাএদের মৌলিক বিষয়গুলোর দাও'আত্‌ প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উভয় গ্রন্থই alhassanain.org/Bengali ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে।]

অন্যদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত কিতাব হিসেবে কোরআন মজীদকে মুসলমানদের জন্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলাদা

কোনো দলীল উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ, কেউ যদি কোরআন মজীদকে অকাট্য মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ না করে তাহলে তার ঈমানই থাকে না।

আর যেহেতু মুতাওয়াতি হাদীছ হচ্ছে তা- ই যা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে গ্রন্থাবদ্ধকরণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এতো বেশী সংখ্যক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়েছে মিথ্যা রচনার জন্য যতো লোকের পক্ষে একমত হওয়া বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় সেহেতু এ ধরনের হাদীছ যে সত্যি সত্যিই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে এসেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এছাড়া যে সব আমল বা যে সব মত হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পর থেকে ধারাবাহিকভাবে মাযহাব ও ফিরক্বাহ্ নির্বিশেষে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে এসেছে সেগুলো উপরোক্ত তিন সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে চলে আসার ক্ষেত্রে তার নির্ভুলতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ধরনের আমল বা মতের সাথে পরবর্তীকালে- ধরা যাক, পাঁচশ ' বা হাজার বছর পরে- কেউ দ্বিমত করলে তার কোনোই মূল্য হতে পারে না।

এ ধরনের আমল ও মতকে আমরা ইজমা'এ উম্মাহ্ হিসেবে অভিহিত করছি। বলা বাহুল্য যে, এ পরিভাষাটি আমরা ফিক্বাহ্ শাস্ত্রের আলোচনায় অন্যতম তথ্যসূত্র হিসেবে যে ইজমা'- র কথা বলা হয় তা থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছি- যে অর্থ আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। আর এ ইজমা'এ উম্মাহ্ হচ্ছে অকাট্যভাবে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর উদঘাটনকারী।

ইসলামী 'আক্বাএদের মূলনীতি ও এর শাখা- প্রশাখাসমূহ এবং ফরয ও হারামের বিষয়গুলো কেবল এ চার অকাট্য তথ্যসূত্রের কোনোটি দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। এর বাইরে, কমপক্ষে বর্ণনা ধারাক্রমের প্রথম স্তরে তথা ছাহাবী স্তরে স্বল্পসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হাদীছ (মনীষীদের পরিভাষায় যা খবরে ওয়াহে হাদীছ নামে পরিচিত) ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনীষীদের মতামত কেবল উক্ত চার সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) ও প্রায়োগিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

তবে অত্র আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদের ভিত্তিতেই ফয়ছালায় উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করবো। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে অকাট্য ফয়ছালায় উপনীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দলীলগুলোর আশ্রয় নিতে গেলে আলোচনা শুধু দীর্ঘই হবে না, বরং অবিতর্কিত ফয়ছালায় উপনীত হওয়াও বেশ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কারণ, এমনকি কোনো মুতাওয়াতি হাদীছ সম্পর্কেও কেউ তার মুতাওয়াতি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। ফলে এরূপ সম্ভাব্য সন্দেহ মোকাবিলার জন্য অনেক বেশী বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে; খবরে ওয়াহে হাদীছের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার, বিশেষ করে যখন পরস্পর বিরোধী হাদীছের অস্তিত্ব থাকে। তাই অত্র গ্রন্থে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা কেবল এমন খুবই সীমিত সংখ্যক হাদীছের দলীল গ্রহণ করেছি যেগুলোর যথার্থতা সম্বন্ধে ইজমা'এ উম্মাহরয়েছে। এর বাইরে কদাচিৎ অন্য কোনো দলীল উপস্থাপন করলে তা কেবল সহায়ক হিসেবে, মূল দলীল হিসেবে নয়।

সর্বোপরি, যদি 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদ কোনো বিষয়ে অকাট্য ফয়ছালায় উপনীত হবার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীলের দ্বারস্থ হয়ে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

কোরআন মজীদে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্- আহযাবের ২৮ নং আয়াত থেকে ৩৩ নং আয়াতের প্রথমাংশ পর্যন্ত হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ সম্পর্কে নির্দেশাদি দিয়েছেন এবং এরপর ৩৩ নং আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আহলে বাইতের কথা উল্লেখ করেছেন। আয়াতগুলো হচ্ছে :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য (ভোগ-বিলাসিতা) কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ্য উপকরণাদির ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে বিদায় করে দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে এবং পরকালের গৃহকে কামনা কর তাহলে অবশ্যই (জেনো যে,) আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য মহাপুরষ্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। হে নবী- পত্নীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে এবং নেক আমল সম্পাদন করবে সে জন্য তাকে আমি দুই বার পুরষ্কার প্রদান করবো এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযক্ব প্রস্তুত করে রেখেছি। হে নবী- পত্নীগণ! তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও; (অতএব,) তোমরা যদি তাক্ওয়া অবলম্বন করে থাকো তাহলে তোমরা (পরপুরুষদের সাথে) তোমাদের কথায় কোমলতার (ও আকর্ষণীয় ভঙ্গির) আশ্রয় নিয়ো না, কারণ, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হবে। বরং তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলো। আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহেলীয়াত্- যুগের সাজসজ্জা প্রদর্শনীর ন্যায় সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। আর তোমরা নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান।"

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ৩৩ নং আয়াতের শেষাংশে আহলে বাইতকে সম্বোধন করে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত আলোচনা ও নির্দেশাদির লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবিগণ। প্রথমে নবী করীম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে তাঁর 'স্ত্রীগণকে' সতর্ক করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দান করা হয়েছে। এরপর সরাসরি তাঁদেরকে 'হে নবী- পত্নীগণ!' বলে সম্বোধন

করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে বুঝাবার জন্য كُنتُنَّ, تُرِدنَ, مِنكُنَّ ইত্যাদিতে বহুবচনে স্ত্রীবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার থেকে এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকছে না যে, এ সব কথার লক্ষ্য তাঁরাই। কিন্তু ৩৩ নং আয়াতের শেষাংশে আহলে বাইতকে সম্বোধন করে কথা বলার ক্ষেত্রে عَنكُم ও يُطَهِّرَكُم বলা হয়েছে- যাতে বহুবচনে পুরুষবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় বহুবচনে দু'টি ক্ষেত্রে পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয় : শুধু পুরুষ বুঝাতে এবং নারী ও পুরুষ একত্রে বুঝাতে।

অতএব, এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে "আহলে বাইত" কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কারণ, যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পরিবারে কেবল তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন; কোনো নাবালেগ (এমনকি সাবালেগও) পুরুষ সন্তান ছিলেন না, সেহেতু "আহলে বাইত" কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হলে আগের মতোই বহুবচনে স্ত্রীবাচক সম্বোধন ব্যবহার করা হতো। অতএব, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এখানে কথাটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সে অর্থে নারী ও পুরুষ উভয়ই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত- এর মধ্যে শামিল রয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আহলে বাইত- এ শামিলকৃত পুরুষ সদস্য কে বা কারা এবং নারী সদস্যই বা কে অথবা কারা? এ নারী সদস্য কি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ, নাকি অন্য কেউ, নাকি তাঁর বিবিগণের সাথে অন্য কেউ?

এখানে আমাদেরকে আয়াতের বক্তব্যের ও তার বাচনভঙ্গির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ সম্পর্কে এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে তাঁদেরকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, বরং চরম পত্র দেয়া হয়েছে, কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে এবং কয়েকটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে। চরম পত্রের বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য (ভোগ-বিলাসিতা) কামনা করলে তাঁদেরকে বিদায় করে দেয়া হবে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা

পার্থিব উপায়-উপকরণাদির জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

এছাড়া তাঁদেরকে পরবর্তী বক্তব্যে যে সব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ও নিষেধ করা হয়েছে সে সব বিষয়ে কোরআন মজীদের অন্যত্র সাধারণভাবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল মু'মিনা নারীকেই সতর্ক ও নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও নবী-পত্নীগণকে স্বতন্ত্রভাবে সতর্কীকরণ ও নিষেধকরণ থেকে এ ইঙ্গিত মিলে যে, অন্য মু'মিনা নারীদের মতোই তাঁদেরও ঐ সব বিষয় থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত নয়, কিন্তু রাসূলের (ছ্বাঃ)-এর বিবি হিসেবে তাঁর মর্যাদার সাথে জড়িত বিধায় তাঁদের এ সব থেকে মুক্ত থাকা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং এ কারণেই তাঁদেরকে আলাদাভাবে সতর্ক করা ও নিষেধ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুস্পষ্ট যে, একই অপরাধ করলে সাধারণ মু'মিনা নারীর তুলনায় তাঁদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার ফয়ছালার কারণও এটাই যে, তাঁদের আচরণের সাথে রাসূলের (ছ্বাঃ) ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা জড়িত।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বিদায় করে দেয়ার হুমকির ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবিগণের সকলকে একত্রে শামিল করা হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে দাবী তোলা বা চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই শামিল ছিলেন।

যদিও, উল্লেখ না করলে নয় যে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণ স্বামীর কাছে স্বাভাবিক ভরণ-পোষণ ও ভোগোপকরণ 'দাবী' করলে, এবং এমনকি তার অতিরিক্ত অলঙ্কারাদি ও আরাম-আয়েশের উপকরণাদির জন্য 'আবদার' করলে তা গুনাহর কাজ নয়, তেমনি স্বামীর জন্যও স্ত্রীকে বা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দেয়া নাজায়েয নয়। কিন্তু রাসূলের (ছ্বাঃ) বিবি হওয়ার মর্যাদার এটাই দাবী ছিলো যে, তিনি যা কিছু দিতে সক্ষম তার চেয়ে বেশী দাবী করে (এমনকি বধ হলেও) তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাপ সৃষ্টি করা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় হয় নি।

কিন্তু গুনাহর জন্য শাস্তির ভয় দেখানো ও নেক আমলের পুরষ্কারের সুসংবাদের বিষয়গুলোতে তাঁদের সকলকে সম্মিলিতভাবে শামিল না করে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করা হয়েছে ও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর আহলে বাইত সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

"হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান।"

আয়াতের এ অংশে ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতি সতর্কতার সাথে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বাইতকে সম্বোধন করলেও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবিগণের ন্যায় তাঁদেরকে কোনোরূপ সতর্কীকরণ তো দূরের কথা, কোনো আদেশ দেন নি বা নছীহতও করেন নি। বরং এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বাইত সম্পর্কে তাঁর দু'টি ফয়ছালা বা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, তিনি তাঁদের থেকে অপকৃষ্টতা অপসারিত করতে এবং তাঁদেরকে পরিপূর্ণরূপে পূতপবিত্র করতে চান। আর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার বাক্য শুরু করা হয়েছে إنما (অবশ্যই) শব্দ দ্বারা। এর মানে হচ্ছে, এটি একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত; কোনোরূপ দুই সম্ভাবনাযুক্ত বিকল্প সিদ্ধান্ত নয়। এ থেকে আহলে বাইতের ('আঃ) পাপমুক্ততা (عصمة)- ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু এর বাইরে কোরআন মজীদে কোথাওই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই পাপমুক্ততা (عصمة)- এর ঘোষণা দেয়া হয় নি।

[এখানে আমরা বলে রাখতে চাই যে, কারো মা'ছূম্ (معصوم- পাপমুক্ত) হওয়ার মানে এই যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই পাপমুক্ত ছিলেন, কিন্তু কারো মা'ছূম্ না হওয়ার মানে এই নয় যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই পাপ করেছেন। বরং মা'ছূম্ না হওয়ার মানে হচ্ছে, পাপ থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা না থাকা।

এমতাবস্থায় কারো পাপে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পাপী বলে গণ্য করা চলে না।]

কোরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াত সমূহে ব্যবহৃত বাচনভঙ্গি থেকেই সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবিগণ মা'ছূম্ ছিলেন না। অবশ্য কোরআন মজীদে তাঁদেরকে মু'মিনাদের মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-আহযাব্ : ৬) এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁদের কাউকে বিবাহ করা মু'মিনাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয় (সূরাহ্ আল্-আহযাব্ : ৫৩)। এ কারণে তাঁদের সাথে মু'মিনাদের যে সম্মানার্হ সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে তাঁদের মর্যাদাকে পাপমুক্ততার পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো মু'মিনাদের জন্য মাতৃস্বরূপ হওয়া আর মা'ছূম্ হওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক যেমন কোনো মু'মিনা ব্যক্তির জন্মদাত্রী মায়ের সাথে তার সম্মানার্হ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তার মাকে অনিবার্যভাবেই মা'ছূম্ বলে গণ্য করা সঠিক হতে পারে না। এমনকি কোনো মু'মিনা ব্যক্তির পিতা-মাতা যদি কাফেরও হয় তাহলেও তাদের সাথে সম্মানার্হ ও সৌজন্যমূলক আচরণ অব্যাহত রাখার জন্য কোরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঐ মু'মিনা ব্যক্তির এ আচরণ তার পিতা-মাতাকে মু ' মিনে পরিণত করবে না।

মু'মিনাদের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবিগণকে মায়ের ন্যায় সম্মানার্হ গণ্য করার বিষয়টিও একই ধরনের। প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদাই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে মু'মিনাদের জন্য অপরিহার্য করেছে। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) মু'মিনাদের জন্য পিতৃতুল্য, বরং তিনি পিতার চেয়েও অধিকতর সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা পাবার হক্বদার। এমতাবস্থায় তাঁর পরে তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর প্রতি পূর্বানুরূপ সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা বজায় থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তাঁর পরে তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করা হারাম হওয়া ও তাঁদেরকে মাতৃতুল্য গণ্য করা অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু এর দ্বারা কিছুতেই তাঁদেরকে মা'ছূম্ বলে গণ্য করা চলে না।

যদিও অনুরূপ ক্ষেত্রে অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) বিবিগণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কী ছিলো তা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয় নি (এবং তা উল্লেখের প্রয়োজনও ছিলো না)। তবে আমরা নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারি যে, অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) বিবিগণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অভিন্ন ছিলো। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রেও মা'ছূম্ হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মা'ছূম্ থেকে থাকলে তা ব্যক্তি হিসেবে, নবী- রাসূলের ('আঃ) স্ত্রী হিসেবে নয়। তার প্রমাণ, কোরআন মজীদে হযরত নূহ্ ('আঃ) ও হযরত লূত্ব ('আঃ)- এর স্ত্রীর কুফরী ও জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি ঐশী মূলনীতি হিসেবে নবী- রাসূলের ('আঃ) স্ত্রী তথা মু'মিনাদের মাতা হওয়া যদি কারো পাপমুক্ততা নিশ্চিত করতো তাহলে ঐ দু'জন নারী তার ব্যতিক্রম হতো না।

নীতিগতভাবে তথা একটি ঐশী মূলনীতি হিসেবে উম্মাহাতুল মু ' মিনীন অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ- এর মা'ছূম্ না হওয়ার তথা আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত আয়াত সমূহ ও উপরোক্ত আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কোরআন মজীদের আরো কতক আয়াত থেকে এ বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এখানে যা এজমালীভাবে প্রমাণিত হয় অন্য কতক আয়াত থেকে তা দৃষ্টান্ত সহকারে প্রমাণিত হয়।

কোরআন মজীদের সূরাহ্ আত- তাহরীম্ থেকে জানা যায় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বললে তিনি গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর অপর এক স্ত্রীর কাছে বলে দেন। এছাড়া তাঁর দুই স্ত্রী]যথাসম্ভব ঐ দু'জনই অর্থাৎ যারা একজন আরেক জনের কাছে রাসূলুল্লাহ্) ছ্বাঃ -(এর গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন["রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর বিরুদ্ধে" পরস্পরকে সাহায্য করতে তথা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো একটি বিষয়ে চক্রান্ত করতে যাচ্ছিলেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন ও সতর্ক করে দেন এবং তাওবাহ্ করার জন্য নছীহত্ করেন।

[আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত বিভিন্ন হাদীছ-গ্রন্থ ও তাফসীরে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর এ দু'জন স্ত্রীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গোপন কথা সংক্রান্ত ঘটনা ও চক্রান্তের বর্ণনা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত আছে। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদেরকে চিহ্নিত করা আমাদের অত্র আলোচনার জন্য অপরিহার্য নয়। তাই এখানে আমরা তাঁদের কারো নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। বরং আমাদের আলোচনা হচ্ছে একটি নীতিগত আলোচনা। এ কারণে, তাঁদের মধ্য থেকে একজনের ব্যাপারেও যদি মা'ছূম্ না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় (তা যিনিই হোন না কেন) তাহলে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদা কাউকে মা'ছূম্ বানাতে পারে না।]

এরশাদ হয়েছে :

(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ).

"আর নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের কারো কাছে কোনো একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর সে (অন্য কাউকে) তা জানিয়ে দিলো এবং আল্লাহ্ তাঁর [রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর] কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন তখন তিনি (তাঁর ঐ স্ত্রীকে) তার কিছুটা জানালেন এবং কিছুটা জানালেন না। আর তিনি যখন তাকে তা জানালেন তখন সে বললো : কে আপনাকে এটি জানিয়েছে? তিনি বললেন : পরম জ্ঞানী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)ই আমাকে জানিয়েছেন।" (সূরাহ্ আত্-তাহরীম : ৩)

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যে কোনো ঈমানদার কর্তৃক, বিশেষ করে নবীর (ছ্বাঃ) একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক- যাকে তিনি বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলেছিলেন- তাঁর গোপন কথা অন্যের কাছে বলে দেয়া একটি গুরুতর বিষয় ছিলো।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এরপর এরশাদ করেছেন :

(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.)

“ তোমাদের দু’জনের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবাহ্ করো (তো ভালো কথা), নচেৎ তোমরা দু’জন যদি তাঁর (রাসূলের) বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহায়তা করো (তথা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো) তাহলে (জেনে রেখো,) অবশ্যই আল্লাহ্ই তাঁর অভিভাবক, আর এছাড়াও জিবরাঈল, উপযুক্ত মু’মিনাগণ ও ফেরেশতাগণ তাঁর সাহায্যকারী। ” (সূরাহ্ আত্- তাহরীম : ৪)

পরবর্তী আয়াত থেকে মনে হয় যে, তাঁদের দু’জনের কাজটি এমনই গুরুতর ছিলো যে কারণে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে তালাক্ব প্রদান করা হলেও অস্বাভাবিক হতো না। আর তাতে দ্বিবচনের পরিবর্তে স্ত্রীবাচক বহুবচন ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্ত্রীগণের মধ্যে যারা এ চক্রান্তে অংশ নেন নি সম্ভবতঃ তাঁরাও বিষয়টি জানার পরে তাতে বাধা দেন নি বা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- কে সাথে সাথে অবগত করেন নি, তাই এ শথিল্যের কারণে তাঁদেরকেও তালাক্ব দেয়া হলে তা- ও অস্বাভাবিক হতো না।

এরশাদ হয়েছে :

(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)

“ তিনি (রাসূল) যদি তোমাদেরকে তালাক্ব প্রদান করেন তাহলে হয়তো তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম এমন স্ত্রীবর্গ প্রদান করবেন যারা হবে (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পিত, মু ’ মিনাহ্, আজ্ঞাবহ, তাওবাহকারিনী, ‘ইবাদত- কারিনী ও (আল্লাহর পথে) পরিভ্রমণকারিনী এবং পবিত্রা ও কুমারী। ” (সূরাহ্ আত্- তাহরীম : ৫)

এ আয়াতে এ ধরনের ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ঐ সময় জীবিত বিবিগণের কারো মধ্যেই এতে উল্লিখিত সবগুলো গুণ- বশিষ্ট্য বাঞ্ছিত সর্বোচ্চ মাত্রায় ছিলো না। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণ মা’ছূম্ ছিলেন না এবং তাঁরা আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এরপরও অনেকে ভাবাবেগের বশে কেবল আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হবার কারণে তাঁদেরকে পাপ ও ভুলের উর্ধে গণ্য করেন।

তাঁদের এ ভুল ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতই যথেষ্ট হওয়া উচিত- যা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্ত্রীগণের সমালোচনা ও তাঁদের উদ্দেশে উচ্চারিত হুমকির ধারাবাহিকতায় তাঁদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে নাযিল হয়েছে :

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)

"যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রীর উপমা প্রদান করেছেন; তারা দু'জন আমার দু'জন নেক বান্দাহর আওতায় (বিবাহাধীনে) ছিলো, কিন্তু তারা উভয়ই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ফলে তারা দু'জন (নূহ্ ও লূত্ব) তাদের দু'জনকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারলো না; আর তাদেরকে বলা হলো : (অন্যান্য) প্রবেশকারীদের সাথে দোযখে প্রবেশ করো।" (সূরাহ্ আত্- তাহরীম্ : ১০)

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে বিশেষভাবে উম্মাহাতুল্ মু ' মিনীনকে সম্বোধন করে বলেছেন : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)- "আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর।" (সূরাহ্ আল্- আহযাব্ : ৩৩) কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বসম্মত ও মশহূর ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী তাঁদের একজন আল্লাহ্ তা'আলার এ বিশেষ আদেশ অমান্য করে বধ খলীফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং রণাঙ্গনে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন যার পরিণতিতে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, উম্মাহাতুল্ মু ' মিনীন্ মা'ছূম্ ছিলেন না এবং আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত কারা?

আমরা ভূমিকায় যেমন উল্লেখ করেছি, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগ থেকে শুরু করে এ ব্যাপারে একান্ত বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সর্বসম্মত যে মত (ইজমা) চলে এসেছে তা হচ্ছে, কোরআন মজীদে আহলে বাইত বলতে ন্যূনকল্পে হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) এবং হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- কে বুঝানো হয়েছে তেমনি আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) বলতেও ন্যূনকল্পে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ের সমর্থনে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত প্রচুর হাদীছ রয়েছে।

বর্ণনাসূত্রের বিচারে এ বিষয়ক হাদীছগুলো মুতাওয়াতি কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনায় না গিয়েও আমরা বলতে পারি যে, প্রথমতঃ এ সব হাদীছের বিষয়বস্তু ইসলামের চারটি অকাট্য জ্ঞানসূত্রের কোনোটির সাথেই সাংঘর্ষিক নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিলকালে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পুত্রসন্তান না থাকা ও কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে তাঁর বিবিগণ মা'ছূম্ না হওয়া তথা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ক হাদীছগুলো গ্রহণ করা ছাড়া সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশের প্রায়োগিকতা থাকে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে আদৌ তাঁর কোনো আহলে বাইত থাকে না এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশ অর্থহীন হয়ে যায়- যে ধরনের উক্তি থেকে চির জ্ঞানময় সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলা পরম প্রমুক্ত।

অধিকন্তু আয়াতে মুবাহালাহ্ (সূরাহ্ আলে 'ইমরান্ : ৬১) অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে আমল করেন তদসংক্রান্ত যে তথ্যের ওপরে উম্মাহর মধ্যে ইজমা' রয়েছে তা থেকেও উক্ত চারজন মহান ব্যক্তিত্বের আহলে বাইত বা আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য সমর্থন পাওয়া যায়।

নাজরানের খৃস্টান ধর্মনেতাদের কাছে ইসলামের সত্য দ্বীন ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সত্যিকারের পয়গাম্বর হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিরোধিতার ব্যাপারে, বিশেষ করে হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর

ব্যাপারে একগুঁয়েমি করতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লা ' নতের চ্যালেঞ্জ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে নির্দেশ দেন; এরশাদ করেন :

(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)

" (হে রাসূল!) আপনার কাছে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যে আপনার সাথে এ ব্যাপারে ('ঈসার ব্যাপারে) বিতর্ক করে তাকে বলুন : এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লা ' নত করি। " (সূরাহ্ আলে 'ইমরান্ : ৬১)

ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে সমগ্র উম্মাহর কাছে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তথ্য অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) এবং হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- কে স্বীয় চাদর বা 'আবা- র নীচে নিয়ে নাজরানের খৃস্টানদের সাথে মুবাহালাহ্ করতে যান এবং এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে দো ' আ করেন তাতে তাঁদেরকে "এরাই আমার আহলে বাইত " বলে উল্লেখ করেন। এ সংক্রান্ত হাদীছগুলোরও বিষয়বস্তু এমন যা ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্র সমূহের কোনোটির সাথেই সাংঘর্ষিক নয় এবং এ ব্যাপারে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় এটিকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। নচেৎ ধরে নিতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) এ আয়াত অনুযায়ী আমল করেন নি- যে ধারণা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

লক্ষণীয় যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জন্য তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোকে নিয়ে মুবাহালাহ্ করতে যাওয়া অপরিহার্য ছিলো। এ আয়াতে উভয় পক্ষে মুবাহালায় অংশগ্রহণকারীকে তিন ধরনের লোকদেরকে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়, তা হচ্ছে : انفسنا (আমরা নিজেরা), ابنئنا (আমাদের পুত্রগণ/ বংশধর পুরুষগণ) ও نسائنا (আমাদের নারীগণ/ স্ত্রী- কন্যাগণ)। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)

যাদেরকে নিয়ে মুবাহালাহ্ করতে গেলেন সুস্পষ্ট যে, তাঁদের মধ্য থেকে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে ابنئنا (আমাদের পুত্রগণ/ পুরুষ বংশধরগণ) হিসেবে, হযরত ফাতেমাহ্ ('আঃ)কে نسائنا (আমাদের নারীগণ অর্থাৎ প্রিয়তম নারীগণ) ও হযরত আলী ('আঃ)কে انفسنا (আমরা নিজেরা) হিসেবে সাথে নিয়ে যান। অর্থাৎ তিনি তাঁর পুরো আহলে বাইতকে সাথে নিয়ে যান।

এখানে আরো গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে এই যে, মুবাহালাহর আয়াতে যাদেরকে সাথে নিয়ে মুবাহালাহ্ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাঁদের সম্পর্কে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হলে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর জন্য কন্যাকে নয়, বরং তাঁর স্ত্রীগণকে সাথে নিতে হতো, অথবা কন্যার সাথে সাথে স্ত্রীগণকেও সাথে নিতে হতো। অবশ্য জীবিত পুত্রসন্তান না থাকা অবস্থায় নাতিদ্বয়কে নিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও আভিধানিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে জামাতাকে সাথে নেয়ার বিষয়টি এর আওতায় আসে না। কিন্তু যেহেতু মুবাহালাহর ক্ষেত্রে রক্ত বা ববাহিক সম্পর্কের নিকটতম ব্যক্তিদেরকে সাথে নেয়ার যৌক্তিকতা ছিলো না এবং প্রতিপক্ষও তা দাবী করতো না, বরং দু'টি আদর্শিক পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নেতার জন্য আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তাঁর নিকটতম ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী তথা নেতার সাথে যারা ধ্বংস হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট আদর্শের চিরবিলুপ্তি ঘটবে তাঁদেরকে সাথে নিয়েই মুবাহালাহ্ করা অপরিহার্য ছিলো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সকল মত- পথের সূত্রে বর্ণিত হাদীছ- ভিত্তিক সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) হযরত আলী ('আঃ)- এর সাথে তাঁর সম্পর্ককে হযরত মূসা ও হযরত হারূন ('আঃ)- এর মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। এর মানে হচ্ছে, হযরত হারূন ('আঃ) যেরূপ হযরত মূসা ('আঃ)- এর আদর্শিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, ঠিক সেভাবেই হযরত আলী ('আঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আদর্শিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সাথে নিয়ে না গেলে মুবাহালাহ্ অসম্পূর্ণ থাকতো।

সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষও এ বিষয়টি অবগত ছিলো এবং এ কারণে তাঁকে সাথে নিয়ে না গেলে তা প্রতিপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না।

অনুরূপভাবে বুঝা যায়, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) জানতেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে "আমাদের নারীগণ" হিসেবে তথা আহলে বাইতের নারী সদস্য হিসেবে সাথে না নেয়ায় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবাদের আশঙ্কা ছিলো না অর্থাৎ প্রতিপক্ষও জানতো যে, তাঁর স্ত্রীগণ আদর্শিক- পারিভাষিক দিক থেকে তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, পারিভাষিক অর্থে কোনো নবী বা রাসূলের আহলে বাইত বা আলে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অভিধানিক অর্থে পরিবারের সদস্য বা বংশধর হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং এর বাইরে থেকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে একজন নবী বা রাসূলের আহলে বাইত বা আলে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরাই যারা তাঁর আদর্শিক সত্তার অংশ এবং তাঁর আদর্শিক উত্তরাধিকারী। হযরত মূসা ('আঃ) ও হযরত হারূন ('আঃ) এবং হযরত মূসা ও হযরত ইউশা ' বিন্ নূন্ ('আঃ)- এর মধ্যে যে সম্পর্ক ছিলো তা এ ধরনেরই এবং এ কারণেই হযরত ইউশা ' বিন্ নূন্ ('আঃ) হযরত মূসা ('আঃ)- এর পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আদর্শিক নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। একই কারণে হযরত আলী ('আঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহলে বাইত- এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পারিভাষিক অর্থে একজন নবীর আহলে বাইতের সদস্যগণের জন্য পবিত্র রক্তধারা থেকে আগত হওয়া অপরিহার্য হলেও (যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে) কেবল নবীর বংশধর হওয়ার কারণেই যে কেউ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা যেমন হযরত ইবরাহীম ('আঃ)- এর পাপাচারী বংশধরদেরকে ইমামতের প্রতিশ্রুতির বাইরে রেখেছেন (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১২৪), অনুরূপভাবে তিনি হযরত নূহ্ ('আঃ)কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর পাপাচারী পুত্র তাঁর আহল্- এর অন্তর্ভুক্ত নয় (সূরাহ্ হূ : ৪৬)। এর মানে হচ্ছে, একজন

নবীর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্তি পবিত্র রক্তধারা থেকে হলেও কেবল পবিত্র রক্তধারার কারণে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গুণগত অবস্থার কারণে হয়ে থাকে।

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের জবাব

রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কারা এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগের মতৈক্যের বরখেলাফে কোনো কোনো মহল থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অবশ্য তাদের বিভ্রান্তি এক ধরনের নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের। এখানে আমরা তাদের কয়েকটি ব্যাপক প্রচারিত বিভ্রান্তির জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

তাদের একটি বিভ্রান্তিকর মত হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত হচ্ছেন কেবল তাঁর স্ত্রীগণ- যা কথাটির আভিধানিক অর্থের দাবী। তাদের আরেকটি বিভ্রান্তিকর মত হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত হচ্ছেন মূলতঃ তাঁর স্ত্রীগণ, তবে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কন্যা, জামাতা ও নাতিদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

তাদের এ দাবী যে ভিত্তিহীন তা আমরা ওপরে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি- যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আহলে বাইতের শা'নে নাযিলকৃত আয়াত- যা "আয়াতে তাতহী " নামে মশহূ - হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্ত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাঁরা এককভাবে বা হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) এবং হযরত 'আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর সাথে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন।

তাদের সৃষ্ট আরেকটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ইসলামে রক্তধারার বিশেষ মর্যাদা নেই। এর ভিত্তিতে তারা প্রশ্ন তুলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর বংশধরদের মধ্যকার পাপাচারী লোকদেরকেও আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) হিসেবে সম্মান দিতে হবে কিনা?

বলা বাহুল্য যে, তাদের এ বিভ্রান্তি একটি অপযুক্তি (ফ্যালাসি) মাত্র। কারণ, নবুওয়াত্ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামতের গুরুদায়িত্ব কেবল পবিত্র রক্তধারার মানুষের পক্ষেই বহন করা সম্ভব এবং এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এ দায়িত্ব কেবল পবিত্র রক্তধারার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করেছি। আর রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) বংশধরদের মধ্যকার পাপাচারীদেরকে সম্মান প্রদর্শনের প্রশ্নটি একটি অবান্তর প্রশ্ন। কারণ, আলোচ্য ক্ষেত্রে আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কথাগুলো পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, আভিধানিক অর্থে নয়। তাই কেউই রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) বংশধরদের মধ্যকার পাপাচারীদেরকে আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন না, বরং 'বিশেষভাবে' হযরত হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) ও হযরত 'আলী ('আঃ) এবং তাঁদের বংশে আগত এগারো জন ইমামকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়, যদিও 'সম্প্রসারিত অর্থে' অনেকে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) বংশধরদের মধ্যকার সমস্ত নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে থাকেন। আর হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি কেবল আহলে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ক্ষেত্রে বিশেষ ও পারিভাষিক অর্থেই প্রযোজ্য।

তাদের আরেকটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) বলতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীও অন্তর্ভুক্ত। এমনকি কেউ কেউ এমনটিও দাবী করছে যে, আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) বলতে গোটা উম্মাতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)কেই বুঝানো হয়েছে। এ দু'টি সংজ্ঞার মধ্যে কোনোটিই "আল্" কথাটির প্রচলিত সংজ্ঞার পর্যায়ভুক্ত নয় এবং আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ক্ষেত্রে কোনোটির প্রযোজ্যতার সপক্ষে কোনো অকাট্য দলীল নেই, তবে দ্বিতীয়টি নিয়ে আলোচনা অবান্তর। কারণ, জ্ঞানী- মূর্খ ও নেককার- বদকার নির্বিশেষে প্রচলিত সংজ্ঞার উম্মাতে মুহাম্মাদীর (ছ্বাঃ) সকলে আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযে আমরা তাঁদের প্রতি দরূদ পাঠাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন জানাই এমন দাবী পাগল ছাড়া কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবে প্রথমটি যদি আমরা যুক্তির খাতিরে মেনে নেই তো সে ক্ষেত্রে আমরা এর প্রবক্তাদের কাছে সেই ব্যক্তিদের নামের তালিকা চাইতে পারি যাদেরকে তারা আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করতে চাচ্ছে। অতঃপর তাঁদের আমল বিচার করে দেখতে হবে যে, আয়াতে তাতহী

তাঁদের বেলা প্রযোজ্য কিনা। তাঁদের কারো আমলে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের লঙ্ঘন পাওয়া গেলে]উদাহরণ স্বরূপ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শিরকে লিপ্ত থাকা, ইসলাম গ্রহণের পরে নবী করীম)ছ্বাঃ -(এর নবুওয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করা বা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে প্রমাণিত যেনাকারকে শাস্তিদান থেকে বিরত থাকা, কারো বধ সম্পদ বাযেয়াফত করা, কোরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বরখেলাফে আইন জারী করা, কোরআনে ঘোষিত যাকাতের হক্ব থেকে কাউকে বঞ্চিত করা, স্বজনপ্রীতির পরিচয় দেয়া ইত্যাদি[নিঃসন্দেহে আয়াতে তাত্বহী তাঁর বেলা প্রযোজ্য হবে না। আমরা তাঁদের সমালোচনার দফতর খুলে বসতে চাই না, কিন্তু যে মর্যাদা তাঁদের নয় সে মর্যাদা তাঁদেরকে দিতে চাইলে অবশ্যই তাঁদেরকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করার অধিকার মানতে হবে। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী- রাসূল বা ইমাম ও মা'ছূম্ নন যে, তাঁদেরকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করে চোখ বুঁজে আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে যারা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর বিবিগণকে ও ছাহাবীদেরকে তাঁর আহলে বাইত ('আঃ)- এর বা আল্- এর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করছে তাদের এ দাবীর সাথে সাধারণভাবে আহলে সুন্নাতের আহলে বাইত সংক্রান্ত 'আক্বীদাহর সম্পর্ক নেই। কারণ, আহলে সুন্নাতের মধ্যে নামাযের বাইরে বিভিন্নভাবে দরূদ পাঠ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

اللهم صل على سيدنا و نبينا و شافعنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه و ازواجه اجمعين –

" হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা, আমাদের নবী, আমাদের শাফা ' আতকারী ও আমাদের মাওলা মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর আল্, তাঁর ছাহাবীগণ ও তাঁর স্ত্রীদের- সকলের- প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। "

আবার এভাবেও পড়া হয় :

اللهم صل على سيدنا و نبينا و شافعنا و مولانا محمد. صل الله عليه و على آله و اصحابه و ازواجه اجمعين–

" হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা, আমাদের নবী, আমাদের শাফা ' আতকারী ও আমাদের মাওলা মুহাম্মাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো; আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এবং তাঁর আল্, তাঁর ছাহাবীগণ ও তাঁর স্ত্রীদের- সকলের- প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। "

যারা এ দরূদ পাঠ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর ছাহাবীগণকে ও তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর আল্- এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না বলেই তাঁদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেন।

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের আরেকটি বিভ্রান্তিকর অপযুক্তি হচ্ছে এই যে, আয়াতে তাত্বহীরে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বাইতকে পবিত্র করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তাঁদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন নি অর্থাৎ তাঁদেরকে পবিত্র হতে বলেছেন। তারা এ ব্যাপারে ওযূ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ক্ষেত্রে মু'মিনাদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যার মানে তিনি মু'মিনাদেরকে পবিত্র হতে বলেছেন, তাদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন নি।

এদের এ অপযুক্তির প্রথম জবাব হচ্ছে এই যে, ওযূর মাধ্যমে পবিত্র করণের যে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্ত করেছেন তাতে আহলে বাইতের সদস্যগণও শামিল রয়েছেন, তাহলে আয়াতে তাত্বহীরে তাঁদেরকে পুনরায় পবিত্র করতে চাওয়ার মানে কী? এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এতদুভয় ক্ষেত্রে দুই ধরনের পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে : সাধারণ ও বিশেষ। ওযূর ক্ষেত্রে পবিত্রতার মানে হচ্ছে 'ইবাদতের পূর্বপ্রস্তুতি ও পূর্বশর্ত হিসেবে এক ধরনের শারীরিক- মানসিক পবিত্রতা। আর আয়াতে তাত্বহীরে 'পরিপূর্ণরূপে পবিত্রতা ' র মানে হচ্ছে সর্বাবস্থায় মানসিক, আত্মিক ও চন্তিক পবিত্রতা- যা গুনাহ্ ও ভুল থেকে ফিরিয়ে রাখে।

এদের অপযুক্তির দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আহলে বাইতের সদস্যগণ তাঁদের পবিত্র রক্তধারার কারণে সর্বাবস্থায় মানসিক, আত্মিক ও চন্তিক ক্ষেত্রে 'পরিপূর্ণ পবিত্রতা ' র অধিকারী থাকা এবং গুনাহ্ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার 'উপযুক্ততার অধিকারী ' , অতঃপর তাঁরা চাইলে এরূপ থাকতে পারবেন। কিন্তু অন্যরা এ জন্য 'উপযুক্ততার অধিকারী ' নয়, সুতরাং তারা চেষ্টা করলে পবিত্রতার অধিকারী থাকতে ও বড় বড় গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে বটে, তবে যে কোনো সময়ই তাদের ভুল ও বিচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তাদের পক্ষে 'পরিপূর্ণ ' পবিত্রতার অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে না।]আল্লাহ্ তা'আলা যে, তাঁর মনোনীত নবী -রাসূল ও ইমামগণ এবং অন্যান্য খাছ বান্দাহর কাছ থেকে গুনাহে

লিপ্ত হবার ক্ষমতা কেড়ে নেন নি এবং কেন নেন নি সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের ‘ইছমাত্ বা পাপমুক্ততা এ অর্থেই।[

ইসলামে আহলে বাইত- এর মর্যাদা

কোরআন মজীদে ও বিভিন্ন হাদীছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত ('আঃ)- এর দ্বীনী মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে কোরআন মজীদের যে সব আয়াতে এ সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইখলাছের সাথে ও নিরপেক্ষভাবে অর্থগ্রহণ ও ব্যাখ্যা করা হলে সে সব আয়াত থেকেও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত- এর বিশেষ দ্বীনী মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তেমনি বিভিন্ন মুতাওয়াতি হাদীছেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কেবল সেই সব দলীলেরই আশ্রয় নেবো যার তাৎপর্যের ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আহলে বাইতের (আঃ) প্রতি ভালোবাসা ফরয

এ পর্যায়ে প্রথমেই আমরা যা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসাকে মু'মিনাদের জন্য ফরয করেছেন; এরশাদ হয়েছে :

(قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

" (হে রাসূল!) বলুন, আমি এ জন্য (আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে) তোমাদের কাছে আমার ঘনিষ্ঠতমদের জন্য ভালোবাসা ব্যতীত কোনো বিনিময় চাই না। " (সূরাহ্ আশ্- শূরা : ২৩)

এ আয়াতে মু'মিনাদের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্বজনদের (قربى) প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। কারণ, এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, এতে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর স্বজন (قربى) বলতে তাঁর আহলে বাইতকেই ('আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর এতে যদি ব্যাপকতর অর্থে তাঁর আত্মীয়- স্বজন বা বানী হাশেমকে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলেও তাঁদের মধ্যে তাঁর আহলে বাইত ('আঃ) অগ্রগণ্য।

ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর সূত্রে হযরত ফাতেমাহ্ যাহরা ’ (সালামুল্লাহি ‘আলাইহা) এবং হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (‘আঃ)- এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার বিষয়বস্তুসমূহ মুতাওয়াতি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও কেউ হয়তো সে সবের তাওয়াতু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু এ সবের মধ্যে এমন কতোগুলো বিষয় রয়েছে যা বিতর্কের উর্ধে এবং যে সব ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মতৈক্য রয়েছে এবং বর্তমানে দু’একটি নব উদ্ভূত চরমপন্থী ফিরক্বাহ্ ব্যতীত সকলেই একমত। এ সব বিতর্কাতীত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর উম্মাতের মধ্যে হযরত আলী (‘আঃ) ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী।

হযরত আলীর (আঃ) ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এরশাদ করেন :

انا مدينة العلم و على بابها.

“ আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরযা। ”

আমরা জানি যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের আধার (تبيانا لكل شيء)। সুতরাং কোরআন মজীদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত কারো পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর নয়। আর এটা অনস্বীকার্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ছাহাবীগণের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র হাতেগণা কয়েক জন ব্যক্তিগতভাবে পুরো কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ বা মুখস্ত করেছিলেন। আর যে স্বল্পসংখ্যক ছাহাবী পুরো কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করে স্বীয় ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত ‘আলী (‘আঃ) ছিলেন অন্যতম।

কিন্তু কারো কাছে পুরো কোরআন মজীদ থাকলেই বা কারো পুরো কোরআন মজীদ মুখস্ত থাকলেই যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবেন তা নয়। এটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। কারণ, আরব- অনারব নির্বিশেষে আমাদের মুসলমানদের ঘরে ঘরে পুরো কোরআন মজীদ মওজূদ রয়েছে এবং আমরা তা নিয়মিত

তেলাওয়াত করি ও অনেকে নিয়মিত অধ্যয়ন করি; এছাড়া অনেকে আছেন যারা পুরো কোরআনে হাফেয, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এমন ব্যক্তি ক'জন?

অন্যদিকে যার কাছে পুরো কোরআন মজীদ গ্রন্থাকারে মওজূদ ছিলো না বা নেই অথবা মুখস্ত ছিলো না বা নেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এমন কারো পক্ষে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে কোরআন মুখস্ত থাকা বা তা নিয়মিত তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করাই ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবার জন্য জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, একদিকে পুরো কোরআন মজীদের জ্ঞান যথাযথভাবে বুঝতে পারার জন্য কতক পূর্বশর্ত রয়েছে যে সব পূর্বশর্ত কেবল কোরআন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে বা এতদ্বিষয়ক তথ্যসূত্রাদি থেকে অর্জন করা যেতে পারে। বর্তমান যুগে এ ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞত্বমূলক তথ্যসূত্রাদি সহজলভ্য হলেও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগে তিনি স্বয়ং ব্যতীত এ ধরনের কোনো বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বা এতদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞত্বমূলক তথ্যসূত্রের অস্তিত্ব ছিলো না।

দ্বিতীয়তঃ যে সব শাস্ত্রের প্রায়োগিক দিক থাকে সে ধরনের যে কোনো শাস্ত্রেরই প্রায়োগিক দিকের বাস্তব প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ব্যতীত সে শাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। আর হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগে কোরআন মজীদের বাস্তব প্রয়োগ করেছেন তিনি স্বয়ং।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদ নাযিল করা ছাড়াও স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)কে কতক বিধিবিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগের এখতিয়ার প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি কার্যকর করতেন- এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে, যদিও কোরআন মজীদে এ শাস্তির উল্লেখ নেই।

[যারা মনে করেন যে, কোরআন মজীদে বিবাহিত ব্যভিচারীকে সঙ্গে সা (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করার শাস্তির নির্দেশ সম্বলিত আয়াত ছিলো, কিন্তু পরে সে আয়াতের তেলাওয়াত্ মানসূখ্ করা হয় ও হুকূম্ বহাল থেকে যায়, তাঁদের এ মত মোটেই ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজীদের অভ্যন্তরে নাসেখ্ ও

মানসূখের কোনোই কার্যকরিতা নেই। বরং কোরআন মজীদ হচ্ছে নাসেখ্ ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহ হচ্ছে মানসূখ্। এ ব্যাপারে আমি আমার "কোরআনের পরিচয়" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।]

তেমনি নামায পাঁচ ওয়াক্তে সতর রাক্'আত্ ফরয তিনিই নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া তিনি কোরআন মজীদে অনুল্লেখিত এমন উত্তম জিনিসগুলোকে হালাল করে দেন ও নোংরা জিনিসগুলোকে হারাম করে দেন (সূরাহ্ আল্- আ'রাফ্ : ১৫৭)।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পরিপূর্ণ সাহচর্য ছাড়া কারো পক্ষে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। আর এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, হযরত 'আলী ('আঃ) ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পুরো নবুওয়াতী যিন্দেগীর পরিপূর্ণ সাহচর্য লাভ করেছিলেন; অন্য কেউই তাঁর মতো এ সাহচর্যের অধিকারী হন নি।

এর মানে হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ছাহাবীগণের মধ্যে কোরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলের (ছ্বাঃ) তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও পুরোপুরি নির্ভুল জ্ঞান কেবল হযরত আলী ('আঃ)- এর কাছেই ছিলো এবং ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পেতে হলে তাঁর দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য।

হযরত ফাতেমাহ্ ও হাসান- হোসেন (আঃ)- এর মর্যাদা

অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা' রয়েছে এবং এ কারণে জুমু ' আহ্ নামাযের খোত্ববাহ্ সমূহে উল্লেখ করা হয় যে, হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) বেহেশতে নারীদের নেত্রী (سيدة نساء اهل الجنة) এবং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) বেহেশতে যুবকদের নেতা (سيدا شباب اهل الجنة)।

এ হচ্ছে এমন মর্যাদা যা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর কোনো বিবি বা অন্য কোনো ছাহাবীর জন্য বর্ণিত হয় নি।

নামাযের দরূদে আলে মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) মর্যাদা

অন্যদিকে, অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনো নামাযের শেষ রাক্’আতে বসা অবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সাথে সাথে তাঁর আহলে বাইত- এর প্রতি দরূদ প্রেরণের জন্য আল্লাহ্ তা’আলার কাছে আবেদন জানানো অপরিহার্য, নচেৎ নামায ছ্বীহ্ হবে না। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা এ দরূদটি এভাবে পড়ে থাকেন :

اللهم صلِّ علی محمد و علی آل محمد کما صلَّیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم؛ انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم؛ انک حمید مجید .

“হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের প্রতি ছালাত্ করো ঠিক যেভাবে ছালাত্ করেছো ইবরাহীম্ ও আলে ইবরাহীমের প্রতি; অবশ্যই তুমি পরম প্রশংসিত মহামহিম। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের প্রতি বরকত নাযিল করো ঠিক যেভাবে বরকত নাযিল করেছো ইবরাহীম্ ও আলে ইবরাহীমের প্রতি; অবশ্যই তুমি পরম প্রশংসিত মহামহিম।”

এ দরূদটি দরূদে ইবরাহীমী নামে মশহূ । এ দরূদের মধ্যে বিরাট চিন্তার খোরাক রয়েছে। তা হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর প্রতি ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আবেদনের সাথে সাথে তাঁর আহলে বাইত- এর প্রতি কেবল ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের আবেদনই করা হয় নি, বরং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর প্রতি ঠিক সেভাবে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আল্লাহ্ তা’আলার কাছে আবেদন করা হয়েছে যেভাবে হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ)- এর প্রতি আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিল করা হয়েছিলো। অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত- এর প্রতি ঠিক সেভাবে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিলের জন্য আল্লাহ্ তা’আলার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যেভাবে আলে ইবরাহীম্ (‘আঃ)- এর প্রতি আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে ছালাত্ করা ও বরকত নাযিল করা হয়েছিলো। এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতকে আলে ইবরাহীমের (‘আঃ)- এর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আলে ইবরাহীম্ ('আঃ) কারা ছিলেন?

এখানে "আলে ইবরাহীম্" কথাটি যে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে ব্যাপারে বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই। কারণ, এখানে "আলে ইবরাহীম্" বলতে নিঃশর্তভাবে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর পরিবার, বা সন্তানগণ বা বংশধরগণকে বুঝানো হয় নি। কারণ, তাঁর বংশধরগণের মধ্যকার নাফরমানদেরকে মুসলমানদের নামায- মধ্যস্থ দরূদে শরীক করা হবে এ প্রশ্নই ওঠে না।

কোরআন মজীদে ইমামত

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে মানব জাতির জন্য ইমাম বা নেতা মনোনীতকরণ সম্পর্কে এরশাদ করেন :

(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)

" আর ইবরাহীমকে যখন তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা (সাফল্যের সাথে) সমাপ্ত করলো (তাতে উত্তীর্ণ হলো) তখন তিনি (তার রব/ আল্লাহ্) বললেন : অবশ্যই আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নেতা (ইমাম) মনোনীতকারী।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১২৪)

তখন হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) বললেন :

(وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)

" আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও কি (ইমাম নিয়োগ করা হবে)?" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১২৪)

জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন :

(لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

" (হ্যা, অবশ্যই নিয়োগ করবো, তবে) আমার এ অঙ্গীকার যালেমদের জন্য নয়।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১২৪)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে 'পরিপূর্ণ নেককার' দের ব্যাপারে এ অঙ্গীকার করা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে বহু নবী- রাসূলের ('আঃ) আবির্ভাব হয়েছিলো এবং তাঁদের অনেকে নিজ নিজ যুগে দ্বীনী নেতৃত্বের (ইমাতের) অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে অনেকে নবুওয়াত্ ছাড়াই ঐশী হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম ছিলেন। অতএব, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমরা নামাযে যে দরূদ পাঠ করি তাতে যে "আলে ইবরাহীম্" - এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা মূলতঃ হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর বংশে আগত নবী- রাসূলগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নিষ্পাপ ইমামগণকে ('আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর আলে মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) প্রতি আলে

ইবরাহীমের ('আঃ) প্রতি কৃত ছালাতের অনুরূপ ছালাত্ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন জানানোর মাধ্যমে কার্যতঃ আমরা আলে মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) জন্য আলে ইবরাহীমের 'সমতুল্য' মর্যাদার বিষয়টিই স্বীকার করে থাকি। অর্থাৎ আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর তথা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত- এর সদস্যগণ নবী- রাসূল না হলেও তাঁদের মর্যাদা আলে ইবরাহীমের তথা হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর বংশে আগত নবী- রাসূলগণের ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণের ('আঃ) সমতুল্য।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর তথা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত- এর সদস্যগণ যখন নবী- রাসূল নন তখন কীভাবে ও কী কারণে তাঁদের মর্যাদা হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর বংশে আগত নবী- রাসূলগণ ('আঃ)- এর মর্যাদার সমতুল্য হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে নেতা বা ইমাম নিয়োগ এবং এরপর পরবর্তী নেতা বা ইমামগণ সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত জবাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে ইমাম নিয়োগের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত" নেতা বা ইমামের মর্যাদা অত্যন্ত সমুন্নত।]এখানে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ মর্যাদা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামের; কোনো পার্থিব নেতৃত্বের জন্য নয়, এমনকি মুসলিম জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনো দ্বীনী নেতার জন্যও এ মর্যাদা নয়, তা সে নেতা মুসলিম জনগণের সর্বসম্মতিক্রমেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হোন না কেন।[কারণ, হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) দীর্ঘ বহু বছর যাবত রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন এবং বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কেবল এর পরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নেতা বা ইমাম মনোনীত করেন। তাই হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সহ খুব সীমিত সংখ্যক রাসূলই ('আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইমাম মনোনীত হয়েছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত খাছ্ প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পরিস্থিতির প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কখনো নবী পাঠান, কখনো রাসূল পাঠান ও কখনো ইমাম নিয়োগ করেন; কখনো রাসূলকে একই সাথে ইমাম হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন এবং কখনো নতুন কোনো ওয়াহীর প্রয়োজন না থাকায় মওজূদ ওয়াহীর ভিত্তিতে লোকদেরকে হেদায়াত ও পরিচালনার জন্য শুধু ইমাম নিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর নেককার বংশধরদেরকে ইমামত প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দেন তদনুযায়ী হযরত ইসহাক্ব ও হযরত ইয়া ' ক্বূব্ ('আঃ) সহ- যারা ছিলেন নবী- অনেককে ইমামত প্রদান করেন। এরশাদ হয়েছে :

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)

"আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম ইসহাক্বকে ও অতিরিক্ত (দান করলাম) ইয়াকূবকে এবং (তাদের) প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল বানিয়েছি। আর তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি যারা আমার আদেশে লোকদেরকে পরিচালিত করতো এবং তাদেরকে উত্তম কর্ম সম্পাদন, নামায ক্বায়েম রাখা ও যাকাত প্রদানের বিষয়ে ওয়াহী করেছি, আর তারা ছিলো আমার 'ইবাদতকারী (অনুগত বান্দাহ্)। (সূরাহ্ আল্- আম্বিয়া ' : ৭২- ৭৩)

উপরোদ্ধৃত আয়াত দু'টির মধ্যে প্রথম আয়াতে দু'জন নবীর কথা বলা হলেও দ্বিতীয় আয়াতে ইমাম বানানো প্রসঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেবল উপরোক্ত দু'জন নবী ('আঃ)ই ইমাম মনোনীত হন নি, বরং দু'জন নবীর নামোল্লেখ ও অন্য ইমামগণের নামোল্লেখ না করার ফলে এ সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্য ইমামগণ নবী ছিলেন না, তবে নবী না হলেও তাঁরা মওজূদ ওয়াহীর পাশাপাশি ঐশী ইলহাম্- এর ভিত্তিতে লোকদেরকে পরিচালনা করতেন।

[প্রচলিত ইলহাম্ পরিভাষার অর্থে কোরআন মজীদে "ওয়াহী" শব্দ ব্যবহারের একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থাৎ ইলহাম্ হচ্ছে "ওয়াহীয়ে গায়রে মাতলূ"- যা পঠনযোগ্য আয়াত নয়। অন্যদিকে হেদায়াতের এক অর্থ নীতিগতভাবে পথনির্দেশ করা এবং আরেক অর্থ হচ্ছে কার্যতঃ পরিচালনা করা। প্রথমোক্ত ধরনের

ওয়াহী- যাকে কোরআন মজীদের ভাষায় ও পারিভাষিক অর্থে উভয় ক্ষেত্রেই “ওয়াহী” বলা হয় তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের আয়াত এবং দ্বিতীয়োক্ত ধরনের ওয়াহী- যাকে কোরআন মজীদের ভাষায় “ওয়াহী” ও পারিভাষিক অর্থে “ইলহাম্” বলা হয় তা আল্লাহর কিতাবের আয়াত নয়। বরং এ হচ্ছে আয়াত থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তব প্রয়োগের জন্য পরোক্ষ ঐশী পথনির্দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণ সম্পর্কে “আমরিনা” (আমার আদেশ) বলতে একেই বুঝিয়েছেন। এ ছাড়া এ থেকে ভিন্ন কোনো তাৎপর্য গ্রহণের সুযোগ নেই।]

অবশ্য উপরোক্ত আয়াত দু'টি থেকে এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এতে স্বয়ং হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে শামিল করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, নবী নন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এমন কোনো ইমামের অস্তিত্ব ছিলো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র হযরত মূসা ('আঃ)কে কিতাব প্রদান ও তাঁকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক বানানোর কথা উল্লেখ করার পর এরশাদ করেছেন :

(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.)

“আর যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা (বানী ইসরাঈল) ধর্য ধারণ করে এবং আমার আয়াত সমূহের প্রতি ইয়াক্বীন পোষণ করতো ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার আদেশক্রমে পথপ্রদর্শনের জন্য আমি তাদের মধ্য থেকে (বহু ব্যক্তিকে) ইমাম বানিয়েছিলাম।” (সূরাহ্ আস্- সাজদাহ্ : ২৪)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর বংশধরদের মধ্যকার নেককার ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইমাম নিয়োগের বিষয়টি কেবল নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী- রাসূল ও ইমাম মনোনয়নের উদ্দেশ্য বিনা কারণে কেবল তাঁর কতক বান্দাহকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা নয়, বরং এ সব পদ হচ্ছে কতক দায়িত্ব পালনের পদ; দায়িত্বের প্রয়োজনে ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ সব পদে কাউকে মনোনীতকরণ অকল্পনীয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী- রাসূলগণের ('আঃ) দায়িত্ব ছিলো তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। অন্যদিকে আল্লাহর মনোনীত নেতা বা ইমামের দায়িত্ব ঐশী হেদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর

বান্দাহদেরকে সঠিক পথ দেখানো ও সে পথে পরিচালিত করা, আর যে সব নবী- রাসূল ('আঃ) একই সাথে ইমাম বা নেতা ছিলেন তাঁরা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথে এ দায়িত্বও পালন করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ বাণী (কোরআন মজীদ) নাযিল করা ও তা সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নতুন কোনো নবী বা রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা থাকে নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী আল্লাহর বান্দাহদেরকে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা একইভাবে থেকে যায়। আর বলা বাহুল্য যে, পাপমুক্ততা ও নির্ভুলতার নিশ্চয়তা বিহীন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অতএব, নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নিষ্পাপ ও ভুলমুক্ত নেতা বা ইমাম মনোনীত হওয়া অপরিহার্য। নচেৎ বান্দাহদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, ফলে বান্দাহ্ ইখলাছ সহকারে সঠিক ফয়ছালায় উপনীত হবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভ্রান্তিতে নিপতিত হলে সে জন্য পাকড়াও- এর উপযোগী হবে না। আরো এগিয়ে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবীর অবর্তমানে তাঁর বান্দাহেদরকে এরূপ একটি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখবেন তিনি এ ধরনের দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নবী- রাসূল নন এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নেতা বা ইমাম নিয়োগের বিষয়টি যে কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের পরেই প্রাসঙ্গিক হয়েছে, এর পূর্বে প্রাসঙ্গিক ছিলো না তা নয়- যা ইতিমধ্যেই আমরা কোরআন মজীদের আয়াত উল্লেখ করে প্রমাণ করেছি। বস্তুতঃ অতীতে বিভিন্ন নবী- রাসূলের ('আঃ) আবির্ভাবের মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী কালে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের নেতা বা ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত। তেমনি একজন নবীর উপস্থিতিতে তাঁর সহায়তার জন্য যেমন আরো নবী মনোনীত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে]যেমন : হযরত মূসা) 'আঃ -(এর

সাথে হযরত হারূন) ‘আঃ[(তেমনি একজন নবীর উপস্থিতিতে তাঁর সহায়তার জন্য ইমাম, নেতা বা প্রশাসক মনোনীত করণের দৃষ্টান্তও রয়েছে- যা আমরা পরে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন এরশাদ করেন :

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ).

“আর আমি ইচ্ছা করি যে, ধরণীর বুকে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে তাদের ওপর অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা (ইমাম) বানাই আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাই।” (সূরাহ্ আল্- ক্বাছাছ্ : ৫)

এ আয়াতে যে কেবল এমন নেতার কথা বলা হয়েছে যারা একই সাথে নবী- রাসূল ছিলেন তা নয়। বরং বুঝা যায় যে, কোনো নবীর কাছে আগত হেদায়াত বিকৃত হওয়া ও নতুন করে হেদায়াত সহকারে নতুন নবীর আগমন ঘটার পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালে পূর্ববর্তী অবিকৃত হেদায়াত অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী- রাসূলের গুণাবলী সম্পন্ন বিভিন্ন নেতা বা ইমাম মনোনীত করা হয়েছিলো এবং উক্ত আয়াতে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে আয়াত সমূহের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা অনুযায়ী দৃশ্যতঃ এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলেও এ থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার একটি স্থায়ী নীতির দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যা কোনো স্থান ও কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

শুধু তা- ই নয়, বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াতে বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল (مضارع) বাচক ক্রিয়াপদ نُرِيدُ (আমি ইচ্ছা করি) ব্যবহার করেছেন, অতীত কাল বাচক ক্রিয়াপদ (ارادتُ/ ارادنا) ব্যবহার করেন নি। এখানে কেবল বানী ইসরাঈলের বিষয়টি বুঝানো উদ্দেশ্য হলে অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাই বিধেয় হতো। তার পরিবর্তে

বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল (مضارع) বাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াত নাযিলকালের পরবর্তীকালের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার এ ইচ্ছা প্রযোজ্য।

অবশ্য এখানে অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হলেও তার প্রয়োগ ভবিষ্যতের সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতো, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে বানী ইসরাঈলের কথা বলেন নি, বরং 'ধরণীর বুকে দুর্বল করে রাখা লোকদেরকে' ব্যবহার করেছেন- যা থেকে সুস্পষ্ট যে, এটি একটি সাধারণ নীতি। তা সত্ত্বেও কারো পক্ষে হয়তো তাঁর এ ইচ্ছা কেবল বানী ইসরাঈলের জন্য ছিলো বলে মনে করা সম্ভব হতো, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল বাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ফলে কোরআন নাযিলের সময় থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর প্রযোজ্যতা অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগই থাকছে না।

অন্যদিকে যদিও অন্য অনেক ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায়ও ক্ষেত্রবিশেষে অতীত কালের জন্য বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহারেরও সুযোগ আছে, তবে তাতে যদি এমন নিদর্শন না থাকে যে, তার কার্যকরিতা কেবল অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সে ক্ষেত্রে তার কার্যকরিতা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিন কালেই পরিব্যাপ্ত হবে। আলোচ্য আয়াতের ক্ষেত্রেও তা- ই।

আল্লাহর পক্ষ থেকে শাসক মনোনয়ন : ত্বালূত্- এর দৃষ্টান্ত

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী ছাড়াও ইমাম বা শাসক ও নেতা মনোনীত করার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহর নবী হযরত শামূয়িল্ ('আঃ)- এর সহকারী হিসেবে বানী ইসরাঈলের ওপর ত্বালূত্- কে শাসক হিসেবে মনোনয়ন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর উদ্দেশে এরশাদ করেছেন :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.)

“(হে রাসূল!) আপনি কি মূসার পরবর্তী বানী ইসরাঈলের ঐ লোকদেরকে দেখেন নি ?- যখন তারা তাদের নবীকে বললো : “আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন যাতে আমরা (তার অধিনায়কত্বে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।” তখন সে (উক্ত নবী) বললো : “তোমাদের বেলায় বিষয়টি এমন হবে না তো যে, তোমাদের ওপর যদি যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হয় তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না?” জবাবে তারা বললো : “এটা কী করে সম্ভব যে, আমরা আমাদের বাড়ী- ঘর থেকে ও আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না?” কিন্তু এরপর যখন তাদের জন্য যুদ্ধকে ফরয করে দেয়া হলো তখন তাদের মধ্যকার স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো; আর আল্লাহ্ পাপাচারীদের ব্যাপারে অবগত আছেন। আর তাদের নবী যখন তাদেরকে বললো : “অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ত্বালূতকে রাজা মনোনীত করেছেন।” তখন তারা বললো : “কী কারণে আমাদের ওপর তার রাজত্ব হবে? বরং রাজা হওয়ার ক্ষেত্রে তার তুলনায় আমরাই অধিকতর হক্বদার, কারণ, তাকে অনেক বেশী ধনসম্পদ দেয়া হয় নি।” তখন সে (নবী) বললো : “আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে অনেক বেশী জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ প্রশস্ততা প্রদানকারী সর্বজ্ঞাতা।” (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২২৬- ২২৭)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ত্বালূতকে শাসক হিসেবে মনোনয়নের সপক্ষে আল্লাহর নবী [শামূয়িল্ ('আঃ)]- এর পক্ষ থেকে দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে : অনেক বেশী জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ত্বালূত্- কে রাজা মনোনীত করার কথা বলা হয়েছে, ইমাম মনোনীত করার কথা বলা হয় নি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এ ক্ষেত্রে “মালেক্” শব্দটি এ শব্দের সাধারণ পারিভাষিক অর্থ সার্বভৌম 'রাজা/ বাদশাহ্' থেকে ভিন্ন এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যে কোনো ভাষায়ই একই পরিভাষা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের প্রচলন আছে।

মূলতঃ ত্বালূত্ ছিলেন আল্লাহর নবী হযরত শামূয়িল্ ('আঃ)- এর নেতৃত্বাধীনে বানী ইসরাঈলের জন্য মনোনীত সেনাপতি ও প্রশাসনিক প্রধান মাত্র; বানী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে 'রাজা ' দাবী করার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে 'রাজা ' উপাধি সহ মনোনীত করা হয়। তাছাড়া বানী ইসরাঈল 'রাজা ' দাবী করলেও তাদের দাবীর উদ্দেশ্য কোনো স্বরাচারী সার্বভৌম রাজা মনোনীতকরণ ছিলো না, বরং তারা চাচ্ছিলো প্রতিপক্ষের রাজা- বাদশাহর মোকাবিলায় একজন শৌর্যবীর্য ও জাঁকমকের অধিকারী বীর শাসক ও সেনাপতি।

অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে স্বরাচারী সার্বভৌম রাজা তথা ত্বাগূত্ নিয়োগ করবেন এটা একেবারেই অকল্পনীয়। তাছাড়া ত্বালূত্ যখন তাঁর সন্যদেরকে বলেন :

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ- "অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি নহরের দ্বারা পরীক্ষা করবেন।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২৪৯) তখন এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এমনকি নবীর ('আঃ) অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও ত্বালূত্ কোনো সাধারণ শাসক বা সেনাপতি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ঐশী ইলহামের দ্বারা পরিচালিত একজন নেতা ও শাসক। বরং তিনি ছিলেন একজন নিষ্পাপ নেতা, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ব্যতীত কোনো দায়িত্বের জন্য 'প্রত্যক্ষভাবে ' মনোনীত করবেন- তাঁর সম্পর্কে এটা ভাবাই যায় না। (ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় এখানে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এবং ত্বালূতের মনোনয়নের বিষয়টি সে ধরনের নয়, বরং প্রত্যক্ষ মনোনয়ন।)

অনুরূপভাবে আল্লাহর নবী হযরত দাউ ('আঃ) ও হযরত সুলাইমান্ ('আঃ)- এর জন্যও 'রাজা ' শব্দের ব্যবহার থাকলেও সুস্পষ্ট যে, 'রাজা ' বা 'বাদশাহ্ ' শব্দের আভিধানিক ও বহুলপ্রচলিত পারিভাষিক অর্থের দৃষ্টিতে তাঁরা রাজা বা বাদশাহ্ ছিলেন না, (যদিও বানী ইসরাঈলের চাওয়া পূরণের লক্ষ্যে তাঁদেরকে শৌর্যবীর্য ও জাঁকজমকের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো)। কারণ, কোরআন মজীদের দলীল থেকে রাজতন্ত্র স্বরতন্ত্রের সমার্থক এবং যূলম ও নিপীড়ন মূলক হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

[বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর দুশমনরা যাতে আল্লাহর অনুগত বান্দাহদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করতে না পারে এবং এর ফলে অগভীর চিন্তাচেতনার অধিকারী লোকেরা দ্বীন থেকে বিমুখ না হয় সে লক্ষ্যে আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের জন্য সৌন্দর্যোপকরণ ধারণ ও জাঁকজমক শুধু বধই নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা যরূরীও বটে।]

কোরআন মজীদে ইতিবাচকভাবে সাবা ' র রাণী বিলক্বিসের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

(إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)

" রাজা- বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন অবশ্যই তারা তাকে (ঐ জনপদকে) বিপর্যস্ত করে এবং তার (ঐ জনপদের) সর্বাধিক শক্তিশালী অধিবাসীদেরকে লাঞ্ছিত করে। আর তারা (সব সময়) এরূপই করে থাকে। " (সূরাহ্ আন্- নামল্ : ৩৪)

এ আয়াতে যে وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ- "আর তারা (সব সময়) এরূপই করে থাকে। " বলা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুলুম, বলদর্পিতা ও স্বরতান্ত্রিকতা রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত বশিষ্ট্য। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ত্বালূত্ প্রচলিত পারিভাষিক ও আভিধানিক অর্থের কোনো রাজা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত একজন ইমাম তথা নেতা, শাসক ও সেনাপতি। আর তিনি যে দু'টি গুণে বানী ইসরাঈলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন অর্থাৎ 'ইলমী যোগ্যতা এবং শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত 'আলী ('আঃ) সে দু'টি গুণেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

গাদীরে খূমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ঘোষণা

কোরআন মজীদের উক্ত দলীল সমূহ এবং নামাযে পঠিত দরূদের (যা 'আমলের ক্ষেত্রে ইজমা' প্রমাণ করে) বক্তব্যের আলোকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের পরে তাঁর আহলে বাইত- এর আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ থাকে না। আর এ থেকে গাদীরে খুম্- এ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে, হযরত আলী ('আঃ)কে উম্মাতের জন্য

‘মাওলা ’ বলে পরিচিত করিয়ে দেন তাতে ‘মাওলা ’ শব্দের তাৎপর্য যে ‘নেতা ও শাসক ’ তথা তাঁর পরে তাঁর ‘খলীফাহ্ ’ এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গাদীরে খুম্ সংক্রান্ত হাদীছগুলো মূল বিষয়বস্তুর বিচারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওয়াতুরের অধিকারী। এ সব হাদীছ প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং সকল মাযহাব্ ও ফিরক্বাহর ধারাবাহিকতায় সংকলিত প্রায় সকল হাদীছ- গ্রন্থেই স্থানলাভ করেছে।

গাদীরে খুম্ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনায় কতক বিষয়ে সামান্য বিভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে কোনোই মতপার্থক্য নেই। সংক্ষেপে তা হচ্ছে, বিদায় হ র পর হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ম াহ্ ত্যাগ করে মদীনাহর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে ১৮ই যিল্- হা তারিখে ম াহর অদূরে গাদীরে খুম্ নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পরে প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গীদেরকে যাত্রাবিরতি করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং যে সব ছাহাবী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন, আর যারা তখনো এসে পৌঁছেন নি তাঁদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর নির্দেশে কতগুলো উটের হাওদার গদী একত্র করে একটি মঞ্চের মতো বানানো হয় এবং সকলে এসে পৌঁছলে তিনি হযরত আলী (‘আঃ)কে সাথে নিয়ে সে মঞ্চে আরোহণ করেন। অতঃপর ভূমিকাস্বরূপ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদানের পর তিনি হযরত আলী (‘আঃ)- এর হাত উঁচু করে তুলে ধরে বলেন :

من كنت مولاه فهذا على مولاه.

“আমি যার মাওলা, অতঃপর এই ‘আলী তার মাওলা।”

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে গাদীরে খুমের সমাবেশে এ কথা বলেছিলেন এ ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত নেই, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে দ্বিমত করা হয়েছে। অনেকে এখানে “মাওলা ” (مولى) শব্দের অর্থ করেছেন ‘বন্ধু ’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক ’ ; এর অন্যতম অর্থ ‘শাসক’ হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন নি। অবশ্য ব্যাপক অর্থবোধক এ শব্দটি কোরআন মজীদে ‘বন্ধু ’ ও ‘পৃষ্ঠপোষক ’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তিনটি কারণে এ ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

প্রথমতঃ কোরআন মজীদে মু'মিনাদেরকে পরস্পরের 'বন্ধু' ও 'পৃষ্ঠপোষক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাহ্ আল্- মাএদাহ্ : ৫৫), ফলে স্বাভাবিকভাবেই হযরত আলী ('আঃ)ও মু'মিনাদের অন্যতম 'বন্ধু' ও 'পৃষ্ঠপোষক'। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক হযরত আলী ('আঃ)কে মু'মিনাদের 'বন্ধু' ও 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না। আর বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর নবী কোনো অর্থহীন কাজ করতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ যেমন দাবী করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাহাবীর শা'নে উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রশংসাসূচক কথা বলতেন এবং হযরত আলী ('আঃ) সম্পর্কে তাঁর এ উক্তিটিও তদ্রূপ। যদিও যথার্থতা ছাড়া কেবল উৎসাহ প্রদানের জন্য কোনো ভিত্তিহীন কথা বলা বা ভিত্তিহীন প্রশংসা করার মতো অভ্যাস থেকে নবী- রাসূলগণ ('আঃ) মুক্ত ছিলেন, তথাপি যুক্তির খাতিরে তা সম্ভব মনে করলেও এ জন্য প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ছাহাবীদেরকে সেখানে অপেক্ষা করতে বাধ্য করা সহ যে আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছিলো এরূপ একটি মামূলী বিষয়ের জন্য তার আশ্রয় নেয়া এক ধরনের রসিকতার শামিল- আল্লাহর মনোনীত যে কোনো নবী- রাসূলই ('আঃ) যা থেকে মুক্ত।

তৃতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)- এর দাবী অনুযায়ী নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ও ওয়াহী নাযিল সমাপ্ত হওয়ার পরে মওজূদ ওয়াহীর সঠিক ব্যাখ্যা ও উম্মাতের পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিষ্পাপ ও নির্ভুল ইমাম মনোনীত হওয়া প্রয়োজন অথচ অন্য কাউকে এ দায়িত্বের জন্য মনোনীত করা হয় নি, এমতাবস্থায় গাদীরে খুমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর এ উক্তিতে উল্লিখিত "মাওলা" (مولی) শব্দ থেকে 'শাসক' অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দ্বীনী শাসক জনগণ কর্তৃক নির্বাচিতব্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত

এবার আমরা বিষয়টিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ বাস্তবতার আলোকে দেখতে চাই। তা হচ্ছে, কারো জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের ('আঃ) ফয়ছালাহ্ বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার জন্য হুজ্জাত্ পূর্ণ (ইতমামে হুজ্জাত) হওয়া অর্থাৎ সেটি আল্লাহ্ ও রাসূলের ('আঃ) ফয়ছালাহ্ হওয়ার ব্যাপারে তার মধ্যে ইয়াক্বীন্ সৃষ্টি হওয়া; ইখলাছ সত্ত্বেও ইয়াক্বীনের অধিকারী হতে অক্ষম হলে ঐ ফয়ছালাহ্ না মানার সপক্ষে তার ওযর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এ অবস্থায় আমরা যদি ধরে নেই যে, ইখলাছ্ সত্ত্বেও উম্মাহর সংখ্যাগুরু সদস্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইয়াক্বীন্ সৃষ্টি হয় নি যে, নবুওয়াত্ ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্তির পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে মনোনীত করে দিয়েছেন, বরং তাঁরা ইখলাছের সাথেই মনে করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিসিক্ততার বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহর নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন; সে ক্ষেত্রে উম্মাহর জন্য কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য?

যেহেতু বিষয়টি কোনো আদর্শনিরপেক্ষ নিরেট পার্থিব বিষয়ের (যেমন : রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাজার বা কারখানা পরিচালনা, গৃহের ডিজাইন করা ইত্যাদির) সাথে জড়িত নয়, বরং দ্বীন ও শরী'আহর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সেহেতু ইখলাছের দাবী হচ্ছে এই যে, দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয় নি।

দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য সাধারণভাবে যে গুণাবলী অপরিহার্য এবং যে গুণাবলীর ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে : 'ইলম্, 'আমল্ ও দূরদৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে 'ইলম্- এর অবস্থান সর্বাগ্রে, কারণ, যথাযথ 'ইলম্- এর অধিকারী নন এমন ব্যক্তি ইখলাছ ও "তাক্বওয়া"- র অধিকারী হলেও তাঁর ইখলাছ তাঁকে দ্বীনী ও শর'ঈ বিষয়াদিতে সঠিক ফয়ছালাহ্ প্রদানের যোগ্যতার অধিকারী করবে না। অন্যদিকে যথাযথ 'ইলম্ ব্যতিরেকে কারো পক্ষে প্রকৃত অর্থে

“তাক্বওয়া’- র অধিকারী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, যথাযথ ‘ইলম্- এর অধিকারী নন এমন ব্যক্তি ফরযকে মুস্তাহাব, মুস্তাহাবকে ফরয, মোবাহকে হারাম ও হারামকে মোবাহ্ গণ্য করে বসতে পারেন এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে বসতে পারেন। যেহেতু “তাক্ওয়া ’ - র মানে বিশেষ ধরনের দাড়ি, বিশেষ কাটিং- এর পোশাক, নফল ‘ইবাদত ও তাসবীহ্- তাহ্লীল নয়, বরং “তাক্বওয়া’- র মানে আল্লাহ্ তা’আলার আদেশ- নিষেধকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা এবং কোনো ক্ষেত্রে কমতি- বাড়তি বা বাড়াবাড়ি না করা- যে জন্য যথাযথ ‘ইলম্ থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা’আলা এরশাদ করেন :

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

“ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। ” (সূরাহ্ আল্- ফাত্বির : ২৮)

আর ‘ইলমের অধিকারী ব্যক্তির সাথে অন্যদের তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ্ তা’আলা এরশাদ করেন :

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)

“ (হে রাসূল!) আপনি বলুন : যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?” (সূরাহ্ আয্- যুমার : ৯)

আর যিনি ‘ইলমের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়টি কোনো মুস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় নয়, বরং আনুগত্য লাভ ও অনুসৃত হওয়া হচ্ছে তাঁর অধিকার। আল্লাহ্ তা’আলা এরশাদ করেন :

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى)

“ তাহলে অনুসৃত হওয়ার জন্য সে- ই কি অধিকতর হক্বদার যে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে, নাকি সে যে পথপ্রদর্শিত না হলে পথলাভ করে না?” (সূরাহ্ ইউনুস্ : ৩৫)

যদিও এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা’আলার হেদায়াতের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু নবীর ও যার কাছে নবীর ‘ইলম্ পুরোপুরি রয়েছে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর হেদায়াত্ লাভ করা সম্ভব নয়।

দ্বীনী নেতৃত্বের তিনটি গুণ- বৈশিষ্ট্য

অবশ্য কেবল প্রকৃত অর্থে ও যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী হলেই কারো পক্ষে আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব এবং এ আয়াতে 'জ্ঞানী ' ('আলেম) বলতে এ ধরনের লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে, 'আলেম হিসেবে পরিচিত যে কোনো লোককে নয়। অতএব, সত্যিকারের 'আলেম হলে তিনি অবশ্যই যথাযথ 'আমলের তথা তাক্ওয়ার অধিকারী হবেন এবং ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তাক্ওয়ার অধিকারী ব্যক্তি দ্বীন ও শারী'আহর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারণের চেয়ে কমতি- বাড়তি করতে পারেন না তথা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে পারেন না। সুতরাং তিনি হবেন চরম পন্থা (ইফরাত্ব) ও শিথিল পন্থা (তাফরীত্ব) থেকে মুক্ত তথা ভারসাম্যের ('আদল্- এর) অধিকারী মধ্যম পন্থার অনুসারী (উম্মাতে ওয়াসাত্ব)। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন :

(لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

" তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে পদক্ষেপ করো না। " (সূরাহ্ আল্- হুজুরাত্ : ১) সেহেতু তিনি নিজস্ব বিবেচনায় ইসলামের স্বার্থচিন্তা থেকেও আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবেন না।

তৃতীয়তঃ দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয়া অপরিহার্য যার মধ্যে উপরোক্ত দু'টি গুণ ছাড়াও দূরদৃষ্টি (بصيرت) রয়েছে যাতে তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে উম্মাহকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে পারেন। আমরা নবী- রাসূলগণের ('আঃ) জীবনেও- যাদের সকলেই ছিলেন গুনাহ্ ও ভুলের উর্ধে- এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মনীতি গ্রহণ করেন।

তার চেয়েও বড় কথা, এককভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জীবনে পরিস্থিতি বিবেচনায় যথোপযুক্ত বিভিন্ন কর্মনীতি অনুসরণের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন : তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভের পর প্রথম তিন বছর অত্যন্ত গোপনে বেছে বেছে সুনির্দিষ্ট ও স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে তাঁর দাও ' আত পেশ করেন। এরপর তিনি

ম ায় আরো দশ বছর অহিংস ও প্রতিরোধবিহীন কর্মনীতি অনুসরণ করে প্রচারতৎপরতা চালান; এ সময়ের মধ্যে তিনি মুসলমানদের কতককে হিজরতে পাঠান এবং কিছুদিন অবরুদ্ধ জীবনও কাটান। এরপর তিনি হিজরত করেন, উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে মদীনায় হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে হুকুমতে ইয়াহূদীদের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের সুযোগ দিয়ে ঘোষণাপত্র জারী করেন। মদীনার জীবনে তিনি যুদ্ধ করেন, সন্ধি করেন ও পত্রযোগাযোগ করেন তথা কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। তিনি এমন সব শর্তাবলী সহকারে হুদায়বীয়্যাহর সন্ধি সম্পাদন করেন যা দৃশ্যতঃ তাঁর ও ইসলামের জন্য অপমানজনক ছিলো যে কারণে কতক ছাহাবী এতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এ সন্ধি ইসলামের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে এনেছিলো- সন্ধি সম্পাদিত হবার পর পরই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে এ সন্ধিকে 'সুস্পষ্ট বিজয় ' বলে আখ্যায়িত করে যে কল্যাণ সম্বন্ধে অগ্রিম সুসংবাদ প্রদান করেন।

বস্তুতঃ পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা নেই এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এতো বিচিত্র ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মনীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মোদ্দা কথা, আমরা যদি ধরে নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর অবর্তমানে মুসলমানদের পরিচালনা, নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে মনোনীত করে দেয়া হয় নি, তথাপি ইখলাছের দাবী অনুযায়ী মু'মিনাদের কর্তব্য হচ্ছে এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তির ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা। অতএব, এ থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের পরে মুসলমানদের জন্য হযরত আলী ('আঃ)- এর ওপর নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু তা হয় নি এবং না হওয়ার ফলে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে যে বিভেদ- অনৈক্য, দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও বিভ্রান্তির ধারাবাহিকতার সূচনা হয় তা কারোই অজানা নয়।

ছাহাবীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যরূরী বলে মনে করি।

আমাদের অনেকের মধ্যে মুসলমানদের ইতিহাস, বিশেষ করে বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীগণের ব্যাপারে এমন একটি প্রবণতা আছে যা বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্) ও কোরআন মজীদ সমর্থন করে না। তা হচ্ছে, ঢালাওভাবে তাঁদের প্রতি অন্ধ ভক্তি পোষণ করা- যার ফলে তাঁদের অনেকের ভুলত্রুটি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ও অব্যাহত থেকে যাচ্ছে।

মুসলমানদের অকাট্য ঐতিহাসিক বর্ণনা ও ছহীহ্ হিসেবে চিহ্নিত বহু হাদীছ থেকে যেখানে বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীগণের অনেকের বহু ভুল- ত্রুটির কথা এবং তাঁদের কতকের দ্বারা যেনা, নরহত্যা ও মদপানের মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হবার কথা জানা যায়, এমনকি জানা যায় যে, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও প্রথম চার খলীফাহ্ তাঁদের কতককে বিভিন্ন ধরনের কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন, এছাড়া হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পরে তাঁরা পরস্পর যুদ্ধ করেছেন ও রণাঙ্গনে পরস্পরকে হত্যা করেছেন, তা সত্ত্বেও ঢালাওভাবে তাঁদের সকলকে নক্ষত্রতুল্য, অনুসরণীয় ও সমালোচনার উর্ধে গণ্য করা হচ্ছে এবং সারা দুনিয়া যে বিষয়গুলো জানে তা থেকে স্বয়ং মুসলমানদের না- ওয়াক্বিফ্ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যারা বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীগণের এ সব অপরাধকে ইজতিহাদী ভুল হিসেবে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন তাঁদেরকে চারটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ যথাযথ যোগ্যতা ব্যতিরেকে কারো জন্য ইজতিহাদের নামে কিছু করা জায়েয হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদী ভুল যদি এমন ধরনের হয় যে, এর ফলে অন্যায় ও অবৈধভাবে মানুষের জান- মাল বিনষ্ট হয় তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা ক্ষমাযোগ্য হবার সম্ভাবনা কম। এমনকি তা যদি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমাযোগ্য হয়ও তথাপি পার্থিব জীবনে শর'ঈ বিচারে তা শাস্তিযোগ্য, ঠিক যেভাবে যে কারো যেনার মতো অপরাধের পরকালীন শাস্তি খালেছ্ তাওবাহর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী হুকূমাত্ পার্থিব জীবনে তাকে তার অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই দেবে না। তৃতীয়তঃ এ ব্যাপারে ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে কোনো ব্যতিক্রম থাকতো তাহলে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও প্রথম চার খলীফাহ্ কোনো ছাহাবীকে কোনো

অপরাধের জন্যই শাস্তি দিতেন না, অথচ তাঁরা এ সব অপরাধের জন্য বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীগণকে শাস্তি দিয়েছেন। চতুর্থতঃ তাঁদেরকে নক্ষত্রতুল্য ও সমালোচনার উর্ধে গণ্য করা হলে যে কেউ তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করতে পারে এবং এভাবে দ্বীন ও শরী'আতের লঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত হবার জন্য তাঁদের এ ধরনের মত ও আমলকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; আর কার্যতঃও তাঁদের অনুসরণে কতক ভ্রান্ত ফত্ওয়া প্রদান ও অনুসরণ করা হচ্ছে।

এখানে পরিহাসের ব্যাপার হলো এই যে, যারা ঢালাওভাবে বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীগণের সকলকে নক্ষত্রতুল্য, অনুসরণীয় ও সমালোচনার উর্ধে গণ্য করছেন 'আক্বাএদের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যকার অনেকেই স্বয়ং নবী- রাসূলগণের ('আঃ) জন্য নিষ্পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিকে অপরিহার্য গণ্য করেন না।

যারা ঢালাওভাবে তাঁদের সকলকে নক্ষত্রতুল্য, অনুসরণীয় ও সমালোচনার উর্ধে গণ্য করছেন তাঁরা ভেবে দেখতে প্রস্তুত নন যে, ছাহাবীদের সকলের নক্ষত্রতুল্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি হাদীছ- বর্ণনার সুদীর্ঘ পরম্পরার মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মিথ্যা রচিত হয়ে থাকতে পারে অথবা হয়তো হাদীছ সঠিক কিন্তু 'ছাহাবী ' র যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়, অর্থাৎ কেবল ঈমানের 'ঘোষণা ' সহকারে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে দেখাই 'ছাহাবী ' হওয়া প্রমাণ করে না, বরং শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তাঁর সাহচর্যই (معیت جسمانی و روحانی) কারো 'ছাহাবী ' হওয়া প্রমাণ করে।

এ অন্ধ ভক্তির কারণেই অনেককে ছাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চার খলীফাহকে তাঁদের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সকলের উর্ধে স্থান দিতে দেখা যায়। এটা কতোই না ভুল নীতি যে, যেহেতু তাঁরা চারজন পর্যায়ক্রমে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেহেতু তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে! ঘটনাক্রমে যদি তাঁদের পরিবর্তে অন্য ছাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েক জন ছাহাবী খলীফাহ্ হতেন তাহলে এরা তাঁদেরকেই পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, ছয় সদস্যের নির্বাচনী কমিটির মধ্য থেকে যদি অন্য কেউ তৃতীয় খলীফাহ্ হতেন তাহলে তাঁরা তাঁকেই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ছাহাবীর মর্যাদা দিতেন। (!!)

[প্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীদের অবস্থা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে সংযোজিত "কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগের মুনাফিক্ব" প্রবন্ধে অধিকতর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।]

আহলে বাইত (আঃ)ই ছিলেন শাসনকর্তৃত্বের হক্বদার

বস্তুতঃ গুণাবলীর বিচারে অনস্বীকার্য সত্য হলো এই যে, ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ('আঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে তিনি সাবালেগ হওয়ার তথা শিরক ও গুনাহ্ প্রযোজ্য হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করেন এবং মুহূর্তের তরেও শিরকী যিন্দেগী যাপন করেন নি।

সন্দেহ নেই যে, ইসলাম গ্রহণ অতীতের শিরক ও গুনাহকে মুছে দেয় এবং ব্যক্তি আর সে জন্য শাস্তিযোগ্য থাকে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরূপ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি জীবনে কখনো শিরকে বা অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত হন নি এ দুই ব্যক্তি কখনো এক হতে পারেন না, ঠিক যেভাবে একটি নতুন কাগজে ছবি আঁকা হলে এবং একই ছবি একটি ছবিযুক্ত কাগজের ছবি মুছে তার ওপরে আঁকা হলে দু'টি ছবি গুণের দিক থেকে অভিন্ন হতে পারে না।

এমনকি এ প্রশ্নটি বাদ দিলেও এবং তাক্বওয়া ও বাছীরাতের দৃষ্টিতে কে অগ্রগণ্য সে প্রশ্নও পাশে সরিয়ে রাখলে যেহেতু সর্বসম্মত মত অনুযায়ী 'ইলমের ক্ষেত্রে ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ('আঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে 'আলেমের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন তার ভিত্তিতে তিনি যে ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতঃপর, কেবল এর ভিত্তিতে অর্থাৎ 'ইলমী যোগ্যতার ভিত্তিতে ক্রমবিন্যাস করা হলে]এবং আহলে বাইতের) 'আঃ (অপর ব্যক্তিত্ববর্গের -যারা ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিষয়টি বিবেচনায় না নিলেও[শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হযরত আলী ('আঃ)- এর মর্যাদা সবার ওপরে, অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর মর্যাদা; (তর্কের খাতিরে মেনে নিলে) অপর তিন খলীফাহর মর্যাদা বড় জোর তৃতীয় থেকে পঞ্চম হতে পারে।

অনুরূপভাবে, অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পরে কাউকে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের জন্য মনোনীত করেন নি, তাহলেও সকল বিচারে যে হযরত আলী ('আঃ)কে এবং তাঁর পরে যথাক্রমে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করা অপরিহার্য ছিলো সে ব্যাপারে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। এমনকি যারা চার খলীফাহর খেলাফতকেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করেন তাঁরাও হযরত আলী ('আঃ)- এর পরে যথাক্রমে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর খেলাফতের অধিকারকে স্বীকার করেন।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন করা হয় যে, আহলে বাইতের ('আঃ) ধারাবাহিকতার ইমামগণের, বিশেষতঃ হযরত 'আলী ('আঃ)- এর নামোল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইমাম নিয়োগের কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ নেই কেন? এটা উল্লেখ থাকলে তো আর কোনো বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সুযোগ থাকতো না। বলা হয়, যেহেতু তা উল্লেখ নেই সেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইমামতের ধারাবাহিকতা ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইমাম নিয়োগের দাবী ভিত্তিহীন।

যারা এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেন তাঁরা কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমরা জানি যে, তাওরাত্ ও ইনজীলে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আগমন সম্বন্ধে তাঁর নামোল্লেখ সহ ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। এমনকি স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর যুগেও তাওরাত্ ও ইনজীলে তা উল্লেখ ছিলো বলে মনে করার কারণ রয়েছে। কিন্তু যে সব ইয়াহূদী ও খৃস্টান আলেম ও ধর্মনেতা তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়াকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য করে তারা তাওরাত্ ও ইনজীল থেকে সে সব আয়াত্ তুলে দেয়।

সে যুগে মানব সভ্যতার বিকাশ, লিখন- পঠন ও গ্রন্থসমূহের কপিকরণের অবস্থা যে স্তরে ছিলো তাতে এটা খুব সহজেই করা সম্ভবপর হয়েছিলো। তাই প্রাচীন ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল বারনাবাসের ইনজীলেই নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর নাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে তাঁর নাম থেকে যাওয়ার কারণ এই যে, সেন্ট্ পল্ খৃস্ট জগতের ধর্মীয় নেতৃত্ব একচ্ছত্রভাবে করায়ত্ত করার পর বারনাবাস ও তাঁর লিখিত ইনজীল্ খৃস্ট জগত থেকে বর্জিত হয়ে যায়। ফলে ঐ গ্রন্থের বিরল কপি কোথায় আছে তা লোকেরা জানতোই না; কেবল সাম্প্রতিক কালে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু খৃস্ট ধর্মীয় নেতারা সেটিকে প্রকৃতই বারনাবাসের ইনজীল বলে স্বীকার করেন না বিধায় তা প্রকাশ হওয়ায় খৃস্ট জগতের ওপরে তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন কোরআন মজীদের তাঁর নির্দেশে লিপিবদ্ধ কপিটি ছাড়া মাত্র স্বল্প সংখ্যক ছাহাবী ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ কোরআনের কপি করে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং স্বল্পসংখ্যক ছাহাবী পুরো কোরআন মুখস্ত করেছিলেন। ফলে]হযরত রাসূলে আকরাম) ছ্বাঃ (কর্তৃক লিপিবদ্ধ করানো কপি থাকা সত্ত্বেও[পরবর্তীকালে, প্রথম খলীফাহর উদ্যোগে কোরআন লিপিবদ্ধ করানো হয়েছিলো মর্মে কল্পকাহিনী এবং কোরআনে কম- বেশী হওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন মিথ্যা হাদীছ তরী করা সম্ভব হয়।

তবে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে সমগ্র উম্মাহর মাঝে কোরআন মজীদের একটিমাত্র পাঠ (text- متن) রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদে আহলে বাইতের ইমামগণের, বা ন্যূনকল্পে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর নামোল্লেখ করে তাঁকে ইমাম নিয়োগের কথা থাকলে এতদসংক্রান্ত আয়াত নিয়ে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো। ফলে অসম্ভব নয় যে, এ ধরনের আয়াত সহ ও এ ধরনের আয়াত বাদ দিয়ে কোরআন মজীদের একাধিক পাঠ (text- متن) অস্তিত্বলাভ করতো। বিশেষ করে, মুনাফিক্বরা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতো না। যেহেতু পুরো কোরআনের কপির অধিকারী বা পুরো কোরআন মুখস্তকারী ছাহাবীর সংখ্যা ছিলো অল্প সেহেতু মুনাফিক্বদের পক্ষে এটা খুব সহজেই প্রচার করা সম্ভব হতো যে, এ ধরনের আয়াত কোরআনে ছিলো না, বরং ঐ স্বল্পসংখ্যক ছাহাবী নিজেরা তা যোগ করেছেন। তেমনি

তাদের পক্ষে এ- ও প্রচার করা সম্ভবপর হতো যে, এ ধরনের আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয় নি, বরং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁর জামাতা ও কন্যার বংশধরদেরকে স্থায়ীভাবে মুসলিম উম্মাহর শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগুলো নিজের পক্ষ থেকে যোগ করেছেন। আর সে ক্ষেত্রে সরলমনা ও নবুওয়াত্ সম্পর্কে মযবূত ধারণার অধিকারী ছিলেন না এমন ছাহাবীদের পক্ষে তা বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব ছিলো না।

যারা প্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীদের সকলকে ঢালাওভাবে ঈমান, 'ইলম্ ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ বলে ও সমালোচনার উর্ধে বলে মনে করেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করতে হয় যে, মানব সভ্যতার বিকাশ, বিশেষ করে শিক্ষা ও তথ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে বিশ্ব, বিশেষতঃ আরব ভূখণ্ড তৎকালে যে স্তরে বিরাজ করছিলো সে কারণে প্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীদের মধ্যকার খুব কম সংখ্যকের পক্ষেই পুরো কোরআনের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ও নবুওয়াতের পূর্ণ পরিচিত লাভ করা সম্ভবপর ছিলো। (বস্তুতঃ যাদের কাছে পুরো কোরআনের কপি ছিলো না বা যাদের পুরো কোরআন মুখস্ত ছিলো না তাদের পক্ষে পুরো কোরআনের 'ইলমের অধিকারী হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।)

আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করেছেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁর প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন না অর্থাৎ দ্বীন, আদর্শ ও পথনির্দেশ হিসেবে তিনি যা কিছু বলেন তা ওয়াহীয়ে মাতলূ (কোরআন মজীদ) বা গায়রে মাতলূ তা সত্ত্বেও হুদায়বীয়ায় কোনো কোনো ছাহাবী তাঁর সন্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তেমনি তিনি মৃত্যুশয্যায় একটি ওয়াছীয়াত্ লিখে রেখে যেতে চাইলে কতক ছাহাবী তার বিরোধিতা করেন, এমনকি কেউ কেউ বলেন যে, তিনি অসুস্থতার ঘোরে প্রলাপ বকছেন। অর্থাৎ তাঁর ওয়াছীয়াত্ লেখার বিরোধিতাকারী ছাহাবীগণের যদি কোনো অসদুদ্দেশ্য না থেকে থাকে তো সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বিষয়টি ছিলো এই যে, তাঁদের জানা ছিলো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর মুখ থেকে কোনো অবস্থায়ই, এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও, কোনো ভুল কথা বের হতে দেবেন না।

কতক ছাহাবী যখন মন্তব্য করলেন যে, নবী করীম (ছ্বাঃ) প্রলাপ বকছেন তখন তিনি ওয়াছীয়াত্ লিপিবদ্ধ করানো থেকে বিরত থাকেন। কারণ, এরপরও তিনি তা লিপিবদ্ধ করালে পরবর্তীকালে তার গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে গুরুতর রকমের বিতর্ক সৃষ্টি হতো এবং বিষয়টি ঈমান ও কুফ পর্যন্ত গড়াতো।

অনুরূপভাবে কোরআন মজীদে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের ইমামগণের, নিদেন পক্ষে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর নামোল্লেখ সহ ইমাম নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকলে সে আয়াতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতো এবং সে আয়াত সহ ও তা বাদে কোরআন মজীদের কম পক্ষে দু'টি পাঠ তরী হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা চান নি। বরং বিষয়টি কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে পরোক্ষভাবে থাকায় এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মুতাওয়াতির তথ্যাদি বিদ্যমান থাকায় পরবর্তীকালে চিন্তাশীল লোকদের পক্ষে সেগুলো নিয়ে গবেষণা (তাদাব্বু) করে সঠিক উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের দুর্বলতা, সত্যে উপনীত হবার পথে তাদের সামনে বিরাজমান বাধা- বিঘ্ন ও তাদের মেধা- প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াক্বিফহাল বিধায় বিষয়টি এ অবস্থায় রাখা তাঁর পক্ষ থেকে বান্দাহদের প্রতি অনুগ্রহও বটে। কারণ, এ বিষয়টি কোরআন মজীদের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে যারা তাতে সন্দেহ পোষণ করতো তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যেতো। তার পরিবর্তে বিষয়টি কোরআনে সরাসরি উল্লেখ না থাকায় যারা ইখলাছ্ সত্ত্বেও এতে উপনীত হতে পারে নি তথা এ ব্যাপারে যাদের জন্য ইতমামে হুজ্জাত্ হয় নি তারা আহলে বাইতের ('আঃ) ইমামতকে গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পাকড়াও হবে না; কেবল তারাই পাকড়াও হবে যারা এ বিষয়ে ইতমামে হুজ্জাত্ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করে নি, অথবা এ বিষয়ে বিতর্ক আছে জানা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য চেষ্টা করে নি।

আরো দু ' টি প্রশ্নের উত্তর

আহলে বাইতের, বিশেষ করে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর বিশেষ মর্যাদা এবং কোরআন মজীদ ও বিচারবুদ্ধির আলোকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর অব্যবহিত স্থলাভিষিক্ততা তাঁরই প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে যে, এমতাবস্থায় প্রথম তিন খলীফাহর খেলাফত বধ ছিলো কিনা এবং যে সব ছাহাবী হযরত 'আলী ('আঃ)কে খেলাফতের অধিকার প্রদানে বিরত থাকেন তাঁদের অবস্থা কী?

এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করতে হয় যে, এ বিষয়ে আমরা যদি প্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীদের সম্ভাব্য অবস্থাসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করি তাহলে তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য পাঁচটি অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি :

(১) তাঁদের মধ্যকার একদল জানতেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত 'আলী ('আঃ)কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন এবং এ কারণে তাঁরা খেলাফতকে তাঁরই হক্ মনে করতেন ও সব সময় তাঁর পক্ষে ছিলেন। তাঁরা প্রথম খলীফাহ্ নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন না অর্থাৎ তাঁরা এতদসংক্রান্ত বঠকের খবর জানতেন না বলে তাতে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁরা মনে করতেন যে, হযরত 'আলী ('আঃ) ও বানী হাশেমকে না জানিয়ে খলীফাহ্ নির্বাচনের বঠক অনুষ্ঠান ও খলীফাহ্ নির্বাচন করা ঠিক হয় নি। এ কারণে তাঁরা প্রথম খলীফাহর অনুকূলে বাইআত করা থেকে বিরত থাকার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন এবং কেবল চাপের মুখে অনন্যোপায় হয়ে বাইআত করেন।

(২) তাঁদের মধ্যকার সম্ভাব্য আরেক দল মনে করতেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান নি, বরং বিষয়টি উম্মাতের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে তাঁরা খলীফাহ্ নির্বাচনের বঠকে ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

এদের মধ্যে যারা খলীফাহ্ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা খলীফাহ্ নির্বাচনের ফলাফল জানার পরে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সন্তুষ্ট চিত্তে খলীফাহ্ নির্বাচনকে মেনে নেন ও নির্বাচিত খলীফাহর অনুকূলে বাইআত করেন।

(৩) সম্ভাব্য আরেক দল- এদের সংখ্যাই ছিলো সবচেয়ে বেশী- ছিলেন অগভীর চিন্তার লোক; তাঁদের মধ্যকার কতক লোক খেলাফত্ নির্ধারণ প্রশ্নে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জেনে তাতে ও খেলাফত নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন এবং সে ক্ষেত্রে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর বিষয়টি তাঁদের চিন্তায়ই আসে নি। এ ধরনের লোকদের বেশীর ভাগই- যারা খলীফাহ্ নির্বাচনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না- খলীফাহ্ নির্বাচনের খবর জানার সাথে সাথে কোনোরূপ চিন্তা- ভাবনা না করেই স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দেন এবং ঘটে যাওয়া পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে নির্বাচিত খলীফাহর অনুকূলে বাইআত হয়ে করেন।

(৪) তাঁদের মধ্যকার সম্ভাব্য আরেক দল- যারা খলীফাহ্ নির্বাচনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না- মনে করতেন যে, হযরত 'আলী ('আঃ)ই খেলাফতের হক্বদার, কিন্তু তা সত্ত্বেও- অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও- একটি ঘটে যাওয়া বিষয় হিসেবে খলীফাহ্ নির্বাচনকে মেনে নেন এবং খলীফাহর অনুকূলে বাইআত করেন। পরে তাঁরা তাঁদের বাইআত করার বিষয়টি একটি ভুল কাজ ছিলো বলে মনে করলেও একবার বাইআত করার পরে আর তা থেকে সরে আসা উচিত হবে না বলে মনে করেন।

(৫) সম্ভাব্য আরেক দল জানতো যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত 'আলী ('আঃ)কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিংসা- বিদ্বেষ ও ঈর্ষাবশতঃ তারা হযরত 'আলী ('আঃ)- এর খেলাফত লাভের অধিকার স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে; এরা ছিলো মুনাফিক্ব।

এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, হযরত 'আলী ('আঃ)- এর খেলাফতের হক্ব্ সম্পর্কে উপরোল্লিখিত সম্ভাব্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের জন্য হুজ্জাত্ পূর্ণ হয় নি এবং চতুর্থ দল স্বীয় করণীয় সম্পর্কে দোদুল্যমানতার শিকার হয়েছিলেন। এ তিনটি দল ইখলাছের অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁদের কাজের সপক্ষে ওযর আছে। কিন্তু পঞ্চম দলটি খেলাফতের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) পক্ষ থেকে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর মনোনয়ন সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও

তার বরখেলাফ ও বিরোধিতা করেছিলো- যা ছিলো সুস্পষ্ট নেফাক্ব। সুতরাং তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে পেশ করার জন্য কোনো ওযর থাকবে না।

তবে আমরা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারি না যে, প্রচলিত সংজ্ঞার ছাহাবীদের মধ্যে কে মুখিলছ, আর কে মুনাফিক্ব, বরং বিষয়টি মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিধায় আল্লাহ্ তা'আলার ওপরে সোপর্দ করে দেয়াই উত্তম। অবশ্য ব্যক্তিদের অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে তাঁদের ইখলাছ্ বা নেফাক্ব্ সম্বন্ধে ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হতে পারে, তবে তা প্রাপ্ত তথ্যাদির অকাট্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ওপরে নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, হযরত 'আলী ('আঃ) যদি জানতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনিই খেলাফতের হক্বদার, তাহলে কেন তিনি নির্বাচিত খলীফাহর বিপরীতে নিজেকে খলীফাহ্ হিসেবে ঘোষণা করেন নি এবং স্বীয় হক্ব্ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেন নি, বরং প্রথম তিন খলীফাহকেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, যদিও নবী- রাসূলগণ ('আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মা'ছূম্ ইমামগণ ('আঃ) তাঁদের ঐশী মনোনয়নের অপরিহার্য দাবী অনুযায়ীই মানুষের ওপর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের হক্বদার, কিন্তু তাঁদের যে কারো ক্ষেত্রেই এ অধিকার কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই যখন সংশ্লিষ্ট জনগণ তাঁকে ঐশী মনোনয়নের অধিকারী নেতা ও শাসক হিসেবে চিনতে পারে। তার আগে তিনি নিজের জন্য নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব দাবী করেন নি; নবী- রাসূলগণের ('আঃ) জীবনাচরণ থেকে এ মূলনীতি নিষ্পন্ন হয়।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কেবল তখনি একটি জনপদের (মদীনাহর) জনগোষ্ঠীর ওপর আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর শাসনাধিকার কার্যকর করেন যখন সেখানকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু জনগণ তাঁর রিসালাত্ এবং তাঁর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু ম ায় থাকাকালে তিনি তাঁর এ অধিকার কার্যকর করার উদ্যোগ নেন নি। তেমনি হযরত 'আলী (আঃ) নিজেকে খেলাফতের

হক্বদার জানা সত্ত্বেও তা লাভের জন্য যুদ্ধ করেন নি, বরং জনগণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে খলীফাহ্ নির্বাচন করে কেবল তখনই তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

একই কারণে অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মধ্যে খুব কম সংখ্যকই শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। শুধু তা- ই নয়, বানী ইসরাঈলের অনেক নবীর ('আঃ) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বয়ং নবীর উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি রাজা হিসেবে শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করেছে এবং নবী তা মেনে নিয়ে তার সাথে সহযোগিতা করেছেন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে নবী রাজার বিরুদ্ধে গণ- অভ্যুত্থানে নেতৃত্বও দিয়েছেন।

এ বিষয়টি কার্যতঃ দ্বীনের সাথে রাজার সম্পর্কের ওপরে নির্ভর করতো। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে রাজার বাহ্যিক দ্বীনদারী এবং তার পক্ষ থেকে সমাজে দ্বীনী বিধিবিধান কার্যকর রাখার পরিপ্রেক্ষিতে নবী রাজাকে মেনে নিয়ে তার সাথে সহযোগিতা করতেন। যদিও নবী জানতেন যে, শাসনক্ষমতার হক্বদার তিনি নিজেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সে অধিকার কার্যকর করার চেষ্টা চালানোর পরিবর্তে শান্তি বজায় রাখাকেই দ্বীনের স্বার্থের জন্য অধিকতর সহায়ক বলে মনে করতেন। তবে যে ক্ষেত্রে নবী লক্ষ্য করতেন যে, দ্বীন থেকে রাজার বিচ্যুতি এমন এক পর্যায়ের যে, তাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া ও সহযোগিতা করা উচিত হবে না তখন নবী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছেন বা তাতে সহায়তা দিয়েছেন।

আহলে বাইতের মা'ছূম্ ইমামগণের ('আঃ) জীবনাচরণেও একই ধরনের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তাঁরা কেবল দু'টি কারণ বা দু'টি কারণের মধ্য থেকে যে কোনো একটি কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ক্ষমতাসীন শাসকদেরকে মেনে নিয়েছিলেন। প্রথমতঃ শাসক কর্তৃক বাহ্যতঃ দ্বীনী জীবন যাপন ও সমাজে দ্বীনী বিধিবিধান কার্যকর রাখা- যার বিপরীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশ্রয় নেয়া হলে উভয় পক্ষের ব্যাপক রক্তক্ষয়ের পরিণামে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত দ্বীনী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলামের দুশমনদের দ্বারা দ্বীন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিলো। দ্বিতীয়তঃ শাসক কর্তৃক বাহ্যিক আচরণে দ্বীন থেকে বিচ্যুতি বা সমাজে দ্বীনী বিধি- বিধান কার্যকর না রাখা সত্ত্বেও তার মোকাবিলায় দ্বীনী শক্তি খুবই দুর্বল থাকায় সংঘাতের ফলে দ্বীনের পুরোপুরি বিলুপ্তির আশঙ্কা ছিলো।

অন্যদিকে শাসকের মধ্যে দ্বীন থেকে গুরুতর ধরনের বিচ্যুতির অবস্থায় শাসককে মেনে নিলে বা তার সাথে সহযোগিতা করলে দ্বীনের মূল চেতনাই বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকায় ইমাম ('আঃ) শাসককে মেনে নিতে ও তার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) ইয়াযীদের ক্ষমতারোহণের পরে এ ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে মেনে নিতে ও তার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান।

আদর্শিক ও বংশগত উত্তরাধিকারের অভিন্নতা প্রসঙ্গে

এমনও কেউ কেউ আছেন যারা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর আহ্‌লে বাইতের ('আঃ) নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের অধিকারকে অস্বীকার করার লক্ষ্যে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলামে বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের তথা বংশগত নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের কোনো স্থান নেই। কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন এবং আহ্‌লে বাইতের ('আঃ) নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধিকার প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে এ মতকে কটাক্ষ করে রাজতন্ত্রের সাথে তুলনা করে বলেন, ইসলামে রাজতন্ত্রের স্থান নেই। আর এতে কিছু লোকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা অপরিহার্য।

ইসলামে যে বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের তথা বংশগত নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের এবং রাজতন্ত্রের স্থান নেই, এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আহ্‌লে বাইতের ('আঃ) সর্বাত্মক নেতৃত্বের (অর্থাৎ দ্বীনী ও পার্থিব নেতৃত্বের) সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ, যাদেরকে আহ্‌লে বাইতের ('আঃ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা করা হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সাথে তাঁদের বংশগত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে নয়, বরং তাঁদের গুণাবলীর কারণে। অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা'আলার একই নীতি কার্যকর ছিলো।

অতীতের নবী- রাসূলগণ ('আঃ) নবী- রাসূলগণের ('আঃ) বংশধারায়ই আগমন করেন, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল নবী- রাসূলগণের ('আঃ) বংশধর হওয়ার কারণেই কাউকে নবুওয়াত্‌ প্রদান করা হয় নি এবং নবী- রাসূলগণের ('আঃ) বংশধরদের সকলকেই নবী- রাসূল মনোনীত করা হয় নি।

আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মনোনয়ন সম্বন্ধে এরশাদ করেন :

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)

"অবশ্যই আল্লাহ্‌ জগতবাসীদের ওপরে আদম, নূহ্‌, আলে ইবরাহীম্‌ ও আলে 'ইমরান্‌- কে নির্বাচিত করেছেন; তাদের কতক অপর কতকের বংশধর।" (সূরাহ্‌ আলে 'ইমরান্‌ : ৩৩- ৩৪)

ইমামত বা সর্বাত্মক দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের বিষয়টিও অনুরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)কে ইমাম নিয়োগের কথা জানানো হলে ইবরাহীম্ ('আঃ) এ অঙ্গীকার তাঁর বংশধরদের বেলায়ও প্রযোজ্য কিনা জানতে চান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যে জবাব দেন- যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- তা থেকে এটি প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার ফয়ছালাহর যথার্থতা সম্বন্ধে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বের উদ্রেক হলে তা সুস্পষ্টই ঈমানের পরিপন্থী। তবে এর যথার্থতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে বাস্তবতার আলোকে এর কারণ জানার চেষ্টা করা দূষণীয় নয়, বরং তা ঈমান মযবূত হবার কারণ হতে পারে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নবুওয়াত- রিসালাত ও দ্বীনী ইমামতের দায়িত্ব পালনের জন্য পাপ ও ভুলের উর্ধে থাকার নিশ্চয়তা থাকা অপরিহার্য। আর এ নিশ্চয়তার জন্য রক্তধারার পরিপূর্ণ পবিত্রতাও অপরিহার্য।

অবশ্য পবিত্র রক্তধারার অধস্তন বংশধরদের মধ্যে পাপ ও অপবিত্রতা প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু পাপ ও অপবিত্রতার অধিকারী কোনো ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এ থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব না হলেও তার নিশ্চয়তা থাকে না এবং বাস্তবে এ ধরনের কোনো ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক গঠন সর্বস্তরে পবিত্রতার অধিকারী রক্তধারায় আগত নিষ্পাপ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে না। তাই বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিলক্ষ্যের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে তিনি সৃষ্টিপরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ই এর মৌলিক কাঠামো তথা যাদেরকে নবী- রাসূল ও নিষ্পাপ দ্বীনী ইমাম হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট করে রাখবেন, আর সে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিষ্পাপ ও পবিত্র রক্তধারার মধ্যেই নির্ধারণ করে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক; যাদের পাপমুক্ততা ও ভুলের উর্ধে হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত তাদের মধ্য থেকে নয়।

অধিকতর বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী- রাসূল ও নিষ্পাপ দ্বীনী ইমাম সহ যে সব খাছ বান্দাহকে সৃষ্টি করার বিষয়টি তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৃষ্টির শুরুতে নির্ধারণ

করে রাখেন তাঁরা ব্যতীত অন্য সকলের দুনিয়ার বুকে আগমনের বিষয়টি ছিলো এজমালী এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত 'কারণ ও ফলশ্রুতি ' (Cause and Effect- علت و معلول) বিধির ওপর নির্ভরশীল, সুনির্দিষ্ট নয়।

এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম ('আঃ)- এর বংশে হাজার হাজার কোটি 'মানুষ ' আগমনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আপনার- আমার মতো লোকদের আগমন নির্ধারিত ছিলো না, বরং 'কারণ ও ফলশ্রুতি ' বিধির আওতায় আপনার- আমার আগমন অপরিহার্য হয়ে ওঠার কারণেই আপনার- আমার মতো লোকদের আগমন ঘটে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় নবী- রাসূলগণ, নিষ্পাপ দ্বীনী ইমামগণ ও আরো কতক খাছ বান্দাহর [যেমন : হযরত মারইয়াম ('আঃ) ও হযরত ফাতেমাহ্ (সা.'আঃ)] অন্তর্ভুক্তি ছিলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি (Proper Noun) হিসেবে এবং অন্য সকলের অন্তর্ভুক্তি ছিলো কেবল 'মানুষ ' (Common Noun) হিসেবে।

বস্তুতঃ অনেক লোকের ভ্রান্ত ধারণার বরখেলাফে, নবী- রাসূলগণ, নিষ্পাপ ইমামগণ ও আল্লাহ্ তা'আলার অপর কতক খাছ বান্দাহকে ('আঃ) সৃষ্টির বিষয়টি যে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো শুধু তা- ই নয়, এমনকি তাঁদের নাম- ও পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিলো।

কোরআন মজীদে হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্ব, হযরত ইয়াকূব, হযরত মূসা, হযরত 'ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)- এর নবুওয়াত্ সম্পর্কে তাঁদের জন্মের আগেই নামোল্লেখ সহ সুসংবাদ দেয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নামও পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত 'ঈসা (আঃ) নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর 'আহমা ' নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন (সূরাহ্ আছ- ছাফ্ : ৬)। বারনাবাসের ইনজীলে এখনো তা উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

এছাড়া ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হাদীছ অনুযায়ী, হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের চার

পবিত্র ব্যক্তিত্বের নূরানী রূপ ও ‘নাম ’ দেখতে পান এবং তাঁদেরকে ওয়াসীলাহ্ করে আল্লাহ্ তা’আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ বিষয়টি ইয়াহূদীদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ‘ইদরীস (‘আঃ)-এর কিতাব ’ - এও উল্লেখ করা হয়েছে।

[এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যাপক মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ‘আক্বীদাহরয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)- এর বংশে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন ঘটবে তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদের সকলের ‘নাফস্’ (যদিও ভুল করে বলা হয় ‘রূহ্’) সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এটি ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদী ‘আক্বীদাহ্ থেকে সৃষ্ট একটি কল্পকাহিনী ব নয়- যার পিছনে কোনো অকাট্য দলীল নেই। আর এ কল্পকাহিনীকে যথার্থতা প্রদানের লক্ষ্যে কোরআন মজীদের সেই আয়াতের (সূরাহ্ আল্- আ’রাফ্ : ১৭২) ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা’আলার প্রশ্ন الست بربكم (আমি কি তোমাদের রব নই?) - এর জবাব দেয়া হয়েছিলো : بلى (অবশ্যই)।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো হযরত আদম (আঃ)- এর ভবিষ্যত বংশধরদের থেকে নয়, বরং তাঁর সন্তানদের (بنى آدم) বংশধরদের (من ظهورهم ذريتهم) তথা হযরত আদম (আঃ)- এর সন্তানদের সন্তান ও নাতি- নাত্নীদের কাছ থেকে। অর্থাৎ তা এ দুনিয়ার বুকেই সংঘটিত হয়েছিলো।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি যে, অদৃষ্টবাদীদের ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা’আলা যদি ‘সকল মানুষের’ সৃষ্টি, তাদের জন্ম- মৃত্যু ও ভালো- মন্দ সহ ‘সব কিছু’ই আগেই নির্ধারিত করে রেখে থাকবেন তাহলে সে সবের ঘটা তো ‘অনিবার্য’ হয়ে যায় এবং তাহলে লোকদের আমলের জন্য পুরষ্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা তথা দ্বীন ও শারী’আত্ অযৌক্তিক ও অর্থহীন হয়ে যায়, শুধু তা- ই নয়, বরং সব একবারে নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার ফলে সব সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে যাওয়ায় অতঃপর আল্লাহ্ তা’আলার ‘স্রষ্টা’- গুণ আর অনন্ত কালের জন্য অব্যাহত থাকে না। আমি আমার অপ্রকাশিত গ্রন্থ “অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম”- এ- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।]

ইমামত কেবল ইমাম হোসেনের (আঃ) বংশধারায় কেন

অনেককে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় যে, আহলে বাইতের ('আঃ) ধারাবাহিকতায় ইমামতের বিষয়টি যদি সত্য হবে তো সে ক্ষেত্রে শেষ নয় জন ইমামের সকলেই হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেন? হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে কোনো ইমাম নেই কেন?

বস্তুতঃ ইমামতের 'আক্বীদাহর বিষয়টির ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার কারণেই এ ধরনের প্রশ্নর উদ্রেক হয়। ইমামতের 'আক্বীদাহর ভিত্তি এ নয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার দাবী অনুযায়ী লোকেরা তাঁর আহলে বাইতের ('আঃ) মধ্য থেকে ইমাম বেছে নেবে, বরং ইমামত 'আক্বীদাহর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পর্যায়ক্রমিক স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর আহলে বাইত ('আঃ) থেকে বারো জন ইমাম মনোনীত করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে তা উম্মাহকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বাইতের ('আঃ) মধ্য থেকে কাকে এবং কার বংশধরদের মধ্য থেকে কতো জনকে ইমাম নিয়োগ করবেন এটা একান্তই তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারাধীন ব্যাপার। এ ব্যাপারে কারোই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। যে সব হাদীছে বারো জন ইমামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাতে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর পর্যায়ক্রমিক বংশধরদের মধ্য থেকে নাম ও কার পুত্র কে তা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নের জবাব হিসেবে এটাই যথেষ্ট। তবে আমরা যদি বাস্তবতাকে পর্যালোচনা করি তাহলেও একই উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য হই।

কারবালায় হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর শাহাদাতের সময় তাঁর পুত্র 'আলী ইবনে হোসেন ('আঃ)- যিনি হযরত ইমাম যায়নুল্ 'আবেদীন্ ('আঃ) নামে সমধিক পরিচিত- ছিলেন যুবক এবং সে হিসেবে তাঁর ইয়াযীদী বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তিনি ঐ সময় গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় ছিলেন বিধায় ইয়াযীদী সন্যরা তাঁকে হত্যা

করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় পরে শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এখানে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার বিষয়টি তর্কের খাতিরে বিবেচনার বাইরে রাখলেও 'ইলম্ ও তাক্ওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তাঁর যুগে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য তাঁর তুলনায় যোগ্যতর ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ছিলো না। অনুরূপভাবে তাঁর পুত্র হযরত মুহাম্মাদ বিন্ 'আলী ('আঃ)- যিনি ইমাম বাক্বে ('আঃ) নামে সমধিক পরিচিত- 'ইলমী বিচারে স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁকে "বাক্বেরুল্ 'উলূম্" (জ্ঞানসমূহের ব্যবচ্ছেদকারী) হিসেবে অভিহিত করা হতো। আর তাঁর পুত্র হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ ('আঃ) সম্পর্কে বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, আহলে সুন্নাতের চার জন ইমাম ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাত্র এবং ইসলামী উম্মাহর ইতিহাসে হযরত 'আলী ('আঃ)- এর মাধ্যমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া 'ইলম্ তাঁর মাধ্যমে সর্বাধিক মাত্রায় ফুলে- ফলে বিকশিত হয়- যার সমতুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি পরবর্তী কোনো প্রজন্মেই জন্মগ্রহণ করেন নি। পরবর্তী ইমামগণ ('আঃ) এ 'ইলম্- কেই স্বীয় ভক্ত- অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)- এর বংশে বহু আলেম, বুযুর্গ ও মুজাহিদ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলেও এ ইমামগণের ('আঃ) সমতুল্য কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে নি এবং তাঁরা সাধারণতঃ এ ইমামগণেরই ('আঃ) অনুসরণ করেছেন।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে যরূরী না হলেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ইমাম যায়নুল্ 'আবেদীন ('আঃ)- এর পুত্র হযরত যায় (রাহ্ঃ)- এর নামে যে যায়দী মাযহাব তরী হয়েছে তা তিনি নিজে তরী করেন নি, বরং তাঁর নামে তরী করা হয়েছে। অন্যদিকে হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ ('আঃ)- এর পুত্র ইসমা'ঈল (রাহ্ঃ)- যার নামে ইসমা'ঈলীয়াহ্ মাযহাব তরী করা হয়- তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ ('আঃ)- এর পরে ইমামতে অধিষ্ঠিত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া বারো ইমামের ধারা থেকে [বিশেষ করে হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ব ('আঃ) থেকে] যেভাবে সমগ্র উম্মাহর জন্য 'ইলমী দিকনির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে অন্য কোনো ধারা থেকে তা পাওয়া যায় নি। এ বাস্তবতা হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে পরবর্তী ইমামগণের ('আঃ) মনোনীত হওয়া সংক্রান্ত হাদীছের বাস্তব প্রতিফলনই প্রমাণিত হয়।

রক্তধারার পবিত্রতা : একটি বিভ্রান্তির নিরসন

ইতিপুর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে,   কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে (সূরাহ্ আলে 'ইমরান্ : ৩৩-৩৪) নবী- রাসূলগণ ('আঃ) হচ্ছেন ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (কতক অপর কতকের বংশধর)। এ আয়াতাংশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,   কোনো নবী- রাসূলের ('আঃ) (তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত যে কোনো নিষ্পাপ ইমামের) পূর্বতন রক্তধারায় কখনোই শিরক ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি। যদিও ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ বলতে কেবল একে অপরের অব্যবহিত বংশধরই বুঝায় না, বরং মধ্যবর্তী স্তরে এক বা একাধিক অ- নবী সহ পরবর্তী বংশধরও বুঝায়,   কিন্তু এ মধ্যবর্তী স্তরগুলোতে যদি শিরক ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে পরবর্তী স্তরের নবীকে (এবং সেই সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন নিষ্পাপ ইমামকে) পূর্ববর্তী নবীর বংশধর বুঝাতে ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ- এর উল্লেখ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ,   সে ক্ষেত্রে কথাটি দাঁড়ায় আল্লাহর নবী হযরত আদম ('আঃ)- এর বংশধর হিসেবে নমরূদ ও ফির ' আউন্ সহ সমস্ত মানুষকে নবীর বংশধর বলে উল্লেখ করার অনুরূপ- যার উল্লেখ অর্থহীন ব নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনো ধরনের অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে প্রমুক্ত। অতএব,   সন্দেহ নেই যে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নীতি যে,   তিনি যে কোনো নবী- রাসূলকেই (এবং তাঁর পক্ষ থেকে মনোনীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন নিষ্পাপ ইমামকে) এমন রক্তধারায় পাঠিয়েছেন যাতে কখনোই শিরক বা গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)- এর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণে অনেকেই এটিকে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নীতি হিসেবে গণ্য করতে প্রস্তুত নন।

যদিও এ বিষয়টি নবী-রাসূলগণের ('আঃ) পাপমুক্ততা (عصمة الانبياء) সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সর্বোত্তম এবং অত্র গ্রন্থকারের গ্রন্থ "নবী-রাসূলগণের ('আঃ) পাপমুক্ততা"-য় এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবে আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানেও আমরা সংক্ষেপে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছি।

কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-আন্'আমের ৭৪ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) কর্তৃক আযা ও তার সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার সমালোচনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ابيه آزر (তার "আব্" আযা) উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ থেকেই আযা -কে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)-এর 'জন্মদাতা পিতা' বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিতরূপে ধরে নেয়া সম্ভব নয় যে, আযা তাঁর জন্মদাতা পিতা ছিলো। কারণ, আরবী ভাষায় "আব্" (বাক্যমধ্যে ভূমিকাভেদে ابو/ ابا/ ابى) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক যা দ্বারা জন্মদাতা পিতা ছাড়াও দাদা, চাচা, পালক পিতা ও বিপিতাকে এবং দাদার পূর্ববর্তী যে কোনো পূর্বপুরুষকেও বুঝানো হয়। কিন্তু শুধু জন্মদাতা পিতা বুঝানো উদ্দেশ্য হলে "ওয়ালেদ" (والد) বলা হয়।

এমতাবস্থায় কয়েকটি কারণে উক্ত আয়াতে আযারকে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)-এর জন্মদাতা পিতা বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা যায় না। তা হচ্ছে :

১) আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, এ বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, এমতাবস্থায় জন্মদাতা পিতা বুঝানো উদ্দেশ্য হলে ابيه না বলে والده বললে বিভ্রান্তির কোনোই অবকাশ থাকতো না। অথবা শুধু ابيه বলা হতো, আযরের নামোল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো না। কারণ, যেহেতু শব্দটির প্রথম অর্থ 'জন্মদাতা পিতা' সেহেতু এর সাথে অন্য অর্থজ্ঞাপক নিদর্শন না থাকলে এ থেকে 'জন্মদাতা পিতা' ছাড়া অন্য অর্থ গ্রহণের কোনোই কারণ থাকতো না। এমতাবস্থায় নিদর্শন জুড়ে দেয়া অর্থাৎ আযারের নামোল্লেখ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে শব্দটিকে এর প্রথম

অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, বরং বুঝানো হয়েছে যে, এখানে ابيه বলতে তাঁর জন্মদাতাকে বুঝানো হয় নি, বরং আযারকে (যে সম্ভবতঃ তাঁর পালক পিতা ছিলো) বুঝানো হয়েছে।

২) বিদ্যমান তাওরাতে হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ)-এর জন্মদাতা পিতার নাম 'তেরহ্' বা 'তারেহ্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদে তাঁর জন্মদাতা পিতার নাম "আযার" বলে উল্লেখ করা হলে তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতো ও এর ভিত্তিতে দাবী করতো যে, কোরআন আল্লাহর কালাম নয় বলেই এতে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে এবং এ নিয়ে তারা ব্যাপক প্রচার চালাতো। কিন্তু এ ধরনের প্রতিবাদ ও দাবীর কথা জানা যায় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা ابيه থেকে 'তার জন্মদাতা পিতা' অর্থ গ্রহণ করে নি।

৩) হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) তাঁর নম্রহৃদয় বশিষ্ট্যের কারণে আযারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাগফেরাত কামনা করতেন, কিন্তু তাঁর কাছে যখন অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন (এবং তার জন্য মাগফেরাত কামনা বন্ধ করে দিলেন)। (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ : ১১৪)।

এটা কখনকার ঘটনা কোরআন মজীদে তা উল্লেখ করা হয় নি (উল্লেখের প্রয়োজনও ছিলো না), তবে এটা নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে, হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসে ফিলিস্তিনে হিজরতের আগেই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আযারের ঈমান আনার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। এ কারণে তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তার জন্য মাগফেরাত কামনা বন্ধ করে দেন (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ : ১১৪)। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, হিজরতের বহু বছর পরে তরুণ হযরত ইসমা'ঈল ('আঃ)কে ম ায় আল্লাহর ঘরের পাশে রেখে আসার (সূরাহ্ ইবরাহীম্ : ৩৭) সময়- যার আগেই হযরত ইসহাক্ব ('আঃ)- এর জন্ম হয়েছে ও তিনি [ইবরাহীম্ ('আঃ)] বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন (সূরাহ্ ইবরাহীম্ : ৩৯) (যখন তাঁর বয়স একশ' বছর পেরিয়ে গেছে), তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতার (والدي) মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্

তা'আলার কাছে দোআ করেন (সূরাহ্ ইবরাহীম্ : ৪১)। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আযা তাঁর জন্মদাতা পিতা ছিলো না।

এ উপসংহার থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু হযরত আলী ('আঃ)- এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার, দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তি হওয়ার এবং নবী না হয়েও পাপমুক্ততা সহ নবী- রাসূলগণের ('আঃ) গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত সেহেতু তাঁর পিতৃপুরুষদের রক্তধারায় কখনো শিরক ও গুনাহের সংমিশ্রণ ঘটে নি। অতএব, তাঁর পিতা হযরত আবূ ত্বালিবের মুশরিক হওয়ার ও ইসলাম গ্রহণ না করার দাবী চরম রাজনৈতিক মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বরং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পিতা আবদুল্লাহ্ ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ন্যায় তাঁর চাচা ও হযরত আলী ('আঃ)- এর পিতা হযরত আবূ ত্বালিব্- ও শিরক ও গুনাহ্ থেকে মুক্ত তাওহীদবাদী ছিলেন, আর নবী করীম (ছ্বাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নবী করীম (ছ্বাঃ)কে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, হযরত আবূ ত্বালিব্ কর্তৃক নবী করীম (ছ্বাঃ)কে আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা ও সর্বাত্মক সাহায্য- সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের একটি বিতর্কাতীত বিষয় যে ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি সম্ভব যে, নবীকুলশিরোমণি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভের পরেও বছরের পর বছর ধরে একজন মুশরিকের আশ্রয়ে থাকবেন এবং তার কাছ থেকে সাহায্য- সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করবেন? এরূপ হলে তা কি ইসলামের জন্য একটি লজ্জাজনক ও অপমানজনক বিষয় হতো না? এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার জন্যও কি তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলকে এরূপ লজ্জাজনক ও অপমানজনক অবস্থায় রেখে দেয়া সম্ভব? অতএব, হযরত আবূ ত্বালিব্ মুশরিক ছিলেন বলে যে দাবী করা হয়েছে তা যে স্রেফ রাজনৈতিক মিথ্যাচার ছিলো এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

[এ ধরনের রাজনৈতিক মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে আরো অনেক আছে। হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে ক্ষমতালোভী বলে প্রচার করা হয়েছিলো। তেমনি এ মর্মে মিথ্যা হাদীছ রচনা করা হয়েছিলো যে, নবী করীম (ছ্বাঃ) তাঁর সামনে বসা ছাহাবীদের উদ্দেশে বলেন : 'এখন একজন জাহান্নামী ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করবে', আর হযরত আলী ('আঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন। (!!!)]

পাপমুক্ততা ও এখিতয়ার- এর সমন্বয় কীভাবে

অনেকের ধারণা যে, নবী- রাসূলগণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ইমামগণ ও অন্যান্য খাছ বান্দাহর ('আঃ) পাপমুক্ততা (عصمة)- এর মানে এই যে, তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতাই দেয়া হয় নি। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ, তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতা না থাকলে তাঁরা ফেরেশতার পর্যায়ে গণ্য হতেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতেন না। বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতাই ছিলো না বলে ধরে নেয়ার কারণে অনেক লোক নিজেদের গুনাহর সপক্ষে এটিকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো তাঁদের মধ্য থেকে গুনাহ্ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় নি, সুতরাং তাঁদের অবস্থাকে বাহানা হিসেবে গণ্য করে কারো পক্ষে গুনাহ্ করে পার পেয়ে যাবার কোনোই সুযোগ নেই।

এ বিষয়টিও মূলতঃ 'নবী- রাসূলগণের ('আঃ) পাপমুক্ততা ' সংক্রান্ত আলোচনায় আলোচনার বিষয় এবং উপরোক্ত শিরোনামে অত্র গ্রন্থকারের গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে অত্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক থাকায় এখানেও বিষয়টির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

বস্তুতঃ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের মধ্যে গুনাহ্ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্বেচ্ছায় গুনাহ্ থেকে বিরত থাকেন। এটা সম্ভব হয় তাঁদের রক্তধারার পবিত্রতা, ঈমানের গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং পূত- পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ততার কারণে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে পাপ না করার বিষয়টি তাঁদের গোটা সত্তার (শরীর ও নাফস্ উভয়ের) অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়। ফলে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁরা গুনাহে লিপ্ত হন না এবং তাঁদের সত্তা গুনাহকে গ্রহণ করে না।

[গ্রন্থকারের বাল্যকালে শোনা একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়া হলে বিষয়টি বুঝতে পারা সহজতর হবে বলে মনে করি। ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সংক্ষেপে তা হলো : দু'জন (বা তিনজন) মুসলমান (!) চোর একজন হি র ঘরে সিঁদেল চুরি করে বিভিন্ন মালামাল বাইরে এনে এরপর হাঁড়িপাতিল নেয়ার জন্য রান্নাঘরে প্রবেশ করে। সেখানে একটি পাত্রে তরী রুটি ও একটি পাতিলে রান্না করা মাংস পেয়ে তাকে পাঠার মাংস মনে করে তারা রুটি ও মাংস খেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মাংসের ভিতর কাছিমের পা আবিষ্কৃত হলে তাদের বমি শুরু হয়ে যায় এবং পেট পুরোপুরি খালি হয়ে যাবার পরেও বমির ভাব বন্ধ হয় না,   বরং নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়।

এমনটা কেন হলো?

চুরি করে অন্যের সম্পদ ভোগ করা এবং চুরি করে অন্যের খাবার খাওয়া হারাম জানা সত্ত্বেও তাদের জ্ঞান ও ঈমান তাদেরকে চুরি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি,   কারণ,   তাদের সে ঈমান ছিলো অগভীর। কিন্তু কাছিম হারাম হবার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও ঈমান তাদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণে তাদের পাকস্থলী কাছিমকে কাছিম বলে জানার পরে আর তার মাংসকে গ্রহণ করতে রাযী হয় নি,   যদিও পাঠা বলে জানা অবস্থায় তা গ্রহণ করতে আপত্তি করে নি। অথচ ইসলামী শারী'আতে যা কিছু খাওয়া হারাম করা হয়েছে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণে তা খাওয়ার অনুমতি আছে এবং তাতে গুনাহ্ হবে না;   জীবন বাঁচানোর জন্যও চুরি করে গরুর গোশত খাওয়ার তুলনায় ইঁদুর- বিড়ালের মাংস খাওয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম,   কারণ,   প্রথম ক্ষেত্রে কম হলেও গুনাহ্ হবে,   কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুনাহ্ হবে না।

উপরোক্ত ঘটনায় কাছিম হারাম হওয়ার জ্ঞান ও ঈমান যেভাবে চোরদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো,   একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার যে কোনো নাফরমানী তথা যে কোনো গুনাহর কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান ও ঈমান মা'ছূম ব্যক্তিদের ('আঃ) সত্তার অংশে পরিণত হয়ে যায়।]

কিন্তু যেহেতু তাঁদের গুনাহ্ করার ক্ষমতা হরণ করা হয় নি সেহেতু এ সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি হলেও একেবারে শূন্য নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে,   তিনি যদি আল্লাহর নামে কোনো কথা বানিয়ে বলতেন তাহলে তাঁকে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হতো (সূরাহ্ আল- হাক্কাহ্ : ৪৪- ৪৬)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,   তাঁর থেকে আল্লাহর নামে কোনো কথা বানিয়ে বলার তথা যে কোনো ধরনের গুনাহে লিপ্ত হবার ক্ষমতা

ছিনিয়ে নেয়া হয় নি।]অবশ্য ইন্তেকালের পরে রাসূলুল্লাহ্) ছ্বাঃ (সহ যে কোনো মা'ছূম্ ব্যক্তিরই) 'আঃ (মা'ছূম্ থাকার বিষয়টি সম্পর্কে আর কোনোরূপ অনিশ্চয়তা থাকে নি।[

সুতরাং কারো জন্য মা'ছূমগণের ('আঃ) নিষ্পাপ অবস্থাকে নিজের জন্য গুনাহ্‌র অনুকূলে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। অন্যদিকে মা'ছূম্ না হওয়ার মানেও এ নয় যে, কারো পক্ষেই সারা জীবন পাপমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, বরং সারা জীবন ছোট- বড় যে কোনো ধরনের গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা অন্যদের জন্য খুবই দুরূহ তথা 'প্রায় অসম্ভব ' হলেও 'পুরোপুরি অসম্ভব ' নয়।

সতর্কতার নীতি যা দাবী করে

কেউ যদি মনে করে যে, হযরত আলী ('আঃ)কে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর অব্যবহিত পরবর্তী দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য মনোনীত করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিলো না, বরং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) তা নিজের পক্ষ থেকে করেছিলেন তাহলেও তা মেনে নেয়া উম্মাহ্‌র জন্য অপরিহার্য ছিলো। কারণ, সে ক্ষেত্রে নবী যে তাঁর অনুসারীদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও অধিকতর অধিকার রাখেন (সূরাহ্ আল্- আহ্যাব্ : ৬) সে কারণে তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য ছিলো। কারণ, তিনি ('ভাত খাবেন, নাকি রুটি খাবেন ' - এ জাতীয় নেহায়েতই পার্থিব মোবাহ্ বিষয়াদি ব্যতীত) স্বীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ ওয়াহী (وحی متلو) বা পরোক্ষ ওয়াহী (وحی غیر متلو)- এর ভিত্তিতে ছাড়া কখনো কিছু বলতেন না বা করতেন না। আর বলা বাহুল্য যে, নেতা বা উত্তরাধিকারী মনোনয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى)

“ তিনি (রাসূল) স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা (তিনি যা বলেন) তো ওয়াহী ছাড়া আর কিছু নয়- যা তাঁকে পরম শক্তিধর সত্তা শিক্ষা দান করেন। ” (সূরাহ্ আন্- নাজম্ : ৩- ৫)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন :

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

“ আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। ” (সূরাহ্ আল্- হাশ : ৭)

আর, খোদা না করুন, কেউ যদি মনে করে যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ ছাড়াই, বা (এরূপ নির্ধারণ না থাকার ক্ষেত্রে) সর্বোচ্চ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, কেবল স্বীয় জামাতা হওয়ার কারণেই হযরত আলী ('আঃ)কে উম্মাহর জন্য পরবর্তী নেতা ও শাসক মনোনীত করে গেছেন তাহলে রিসালাত সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ পোষণের কারণে তার ঈমানই বিনষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত খারাপ ধরনের একটি বশিষ্ট্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সহ সকল নবী- রাসূল ('আঃ)ই যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন।

অন্যদিকে কারো কাছে যদি ইখলাছ সত্ত্বেও এরূপ মনে হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) গাদীরে খুমের ভাষণে হযরত আলী ('আঃ)কে যে উম্মাহর জন্য مولى বলে ঘোষণা করেছেন তাতে তিনি এ শব্দ দ্বারা 'বন্ধু ' বুঝাতে চেয়েছেন, সে ক্ষেত্রেও যেহেতু এ শব্দের অন্যতম অর্থ 'শাসক' এবং স্বয়ং হযরত আলী ('আঃ) সহ কতক ছাহাবী এ থেকে এই শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে খেলাফতকে তাঁর হক্ব বলে গণ্য করতেন সেহেতু ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর কাছে গৃহীত 'সতর্কতার নীতি ' র দাবী অনুযায়ী তাঁকেই খেলাফত প্রদান করা কর্তব্য ছিলো। কারণ, যেহেতু, তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল ছিলো না যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এর দ্বারা 'বন্ধু ' বুঝিয়েছেন সেহেতু এতে 'বন্ধু ' বুঝানো হলেও হযরত আলী ('আঃ)কে খলীফাহ্ করা হলে কোনো সমস্যা ছিলো না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) যদি এর দ্বারা 'শাসক' বুঝিয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁকে শাসকের দায়িত্ব প্রদান না করায়

রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

এছাড়া আহলে বাইতের ('আঃ) পাপমুক্ততার অকাট্যতার কারণে বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় অনুযায়ী ইসলামের পরবর্তী নেতৃত্ব- কর্তৃত্বও আহলে বাইতের ('আঃ) ধারাবাহিকতায় থাকা অপরিহার্য ছিলো। এমনকি নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব তাঁদেরকে অর্পণের বিষয়টি কারো কাছে যদি ফরয বলে পরিগণিত না- ও হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও সতর্কতার নীতির দাবী অনুযায়ী তা তাঁদেরকে অর্পণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যরূরী ছিলো।

ইতিপূর্বে আমরা ইসলামের চারটি অকাট্য দ্বীনী জ্ঞানসূত্রের কথা উল্লেখ করেছি এবং খবরে ওয়াহে হাদীছ সমূহ গ্রহণকে এ চার জ্ঞানসূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তসাপেক্ষ বলে উল্লেখ করেছি। এর মানে হচ্ছে, খবরে ওয়াহে হাদীছ চোখ বুঁজে গ্রহণ করা যাবে না, তেমনি তা চোখ বুঁজে বর্জন করাও যাবে না; কেবল চারটি অকাট্য সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক হলেই তা বর্জন করতে হবে।

আমরা যেমন দেখেছি আহলে বাইতের (চার ব্যক্তিত্বের) পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা এবং নেতৃত্ব- কর্তৃত্বের অধিকার- অন্ততঃ অগ্রাধিকার- কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতি হাদীছ ও (সতর্কতার নীতি সহ) 'আক্বলের অকাট্য রায়ের দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে যেহেতু হযরত আলী ('আঃ)- এর 'মাওলা' হবার বিষয়টিও মুতাওয়াতি সূত্রে প্রমাণিত এবং প্রাপ্ত 'আক্বলী (বিচারবুদ্ধিজাত) ও নাক্বলী (বর্ণিত) সকল নিদর্শন থেকে এখানে এ পরিভাষাটির 'নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব' তাৎপর্য প্রমাণিত হয়, সেহেতু অন্ততঃ সতর্কতার নীতির দাবী অনুযায়ী এ তাৎপর্যের ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য ছিলো।

এর সাথে যোগ করতে হয় যে, আরো বিভিন্ন হাদীছে, বিশেষ করে আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতার অনেক হাদীছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের পরে হযরত আলী ('আঃ), হযরত ইমাম হাসান ('আঃ) ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) এবং হযরত ইমাম হোসেন

(‘আঃ)- এর অধস্তন পুরুষ নয়জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখ সহ পর্যায়ক্রমিক ইমামতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

অনেক হাদীছ বিশেষজ্ঞের মতে এ সব হাদীছের মূল বক্তব্য মুতাওয়াতি পর্যায়ের। অবশ্য এর তাওয়াতুরের বিষয়টি গাদীরে খুমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (‘আঃ)কে উম্মাহর জন্য ‘মাওলা ’ ঘোষণার তাওয়াতুরের ন্যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয়। এমতাবস্থায় অপর এগারো জন ব্যক্তিত্বের ইমামত সংক্রান্ত হাদীছ মুতাওয়াতি কিনা এ ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলার অবকাশের কথা মাথায় রেখে এ সব হাদীছকে যুক্তির খাতিরে খবরে ওয়াহে বলে গণ্য করলেও একই বিষয়বস্তুতে এর সাথে সাংঘর্ষিক অনুরূপ পর্যায়ের হাদীছ না থাকায় এর ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য। অর্থাৎ যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে অন্য কোনো লোকদের সম্পর্কে তাঁর পরে পর্যায়ক্রমিক ইমামতের কথা বর্ণিত হয় নি সেহেতু সতর্কতার নীতি অনুযায়ী তাঁদের ইমামতের বিষয়টি মেনে নেয়া অপরিহার্য।

আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতার শীর্ষস্থানীয় অনেক দ্বীনী ব্যক্তিত্বই আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার উক্ত বারো জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের ইমামতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে না নিলেও তাঁদের অনেকের উক্তি ও আচরণে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা উক্ত ব্যক্তিত্ববর্গকে উম্মাহর মধ্যে বিশিষ্ট দ্বীনী মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য করতেন। তাঁরা কখনোই উক্ত বারো জন ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করতেন না এবং তাঁদের নিষ্পাপত্ব (عصمة)কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও কখনোই বলেন নি যে, তাঁরা মা’ছূম্ ছিলেন না বা আর দশজন দ্বীনী বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের অনুরূপ ছিলেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের কাছে তাঁরা অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেছেন।

বিশেষ করে আমরা হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্ঃ)কে- যার নামে পরবর্তীকালে হানাফী মাযহাব্ তরী ও প্রবর্তন করা হয়- আহলে বাইতের (‘আঃ) ধারাবাহিকতার ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফা ছাদেক্ব (‘আঃ)- এর নিকট দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করতে ও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখি। হযরত ইমাম জা’ফা ছাদেক্ব (‘আঃ) সম্পর্কে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহর একটি উক্তি খুবই

বিখ্যাত, তা হচ্ছে, তিনি বলেন : “আমি জা’ফা ইবনে মুহাম্মাদের চেয়ে বড় কোনো আলেমের সাক্ষাৎ পাই নি।” এছাড়াও তিনি যে ইমাম ছাদেক্ব (‘আঃ)- এর কাছে দুই বছর দ্বীনী ‘ইলম্ শিক্ষা করেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন : “ঐ দুই বছর না হলে নুমান্ ধ্বংস হয়ে যেতো।” উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানীফাহর মূল নাম নুমান্ বিন্ ছাবেত্।

এছাড়া হযরত ইমাম মালেক্ও হযরত ইমাম জা’ফা ছাদেক্ব (‘আঃ)- এর কাছে দ্বীনী ‘ইলম্ শিক্ষা করেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালেক যে আহলে বাইত (‘আঃ)- কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁদের আরো কোনো কোনো আচরণ থেকে প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে, এমনকি আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার যে সব বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের জন্য উক্ত বারো জন ব্যক্তিত্বের ন্যায় আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হওয়া সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা বিদ্যমান নেই কেবল আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এ দু’জন ইমাম অন্যদের তুলনায় তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়াহ্ শাসনামলের শেষ দিকে হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (‘আঃ)- এর পুত্র ও হযরত ইমাম বাক্বের (‘আঃ)- এর ভ্রাতা হযরত ইমাম যায়দ (রাহ্ঃ) স্বরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ তাঁকে ‘সত্যিকারের ইমাম’ (ইমামে হাক্ব) বলে ঘোষণা করেন এবং এ জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে লোকদেরকে উৎসাহিত করেন। এছাড়া তিনি এ জিহাদে হযরত ইমাম যায়দকে দশ হাজার দেরহাম আর্থিক সাহায্য দেন এবং বলেন যে, তাঁর নিকট লোকদের বহু আমানত না থাকলে তিনি এ জিহাদে সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া পরবর্তীকালে হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)- এর বংশধর হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফেস যাকীয়্যাহ্ (রাহ্ঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীম্ (রাহ্ঃ)- দুই ভাই- ‘আব্বাসী স্বরশাসক মানছূরের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ এ জিহাদের পক্ষে ফত্ওয়া দেন ও এতে অংশগ্রহণের জন্যে লোকদেরকে উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে মানছূরের একজন

সেনাপতি পর্যন্ত হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্‌র নির্দেশে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান।

অনুরূপভাবে হযরত ইমাম মালেকও 'আব্বাসী স্বরশাসক মানছূরের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফেস যাকীয়্যাহ্ (রাহ্ঃ) ঘোষিত জিহাদকে সমর্থন করে ফত্ওয়া দেন। শুধু তা-ই নয়, স্বরাচারের বিরুদ্ধে এ জিহাদের যথার্থতা জানা সত্ত্বেও মানছূরের অনুকূলে ইতিপূর্বে কৃত বাইআত ভঙ্গ করা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিলে তাঁরা যখন হযরত ইমাম মালেকের মত জানতে চান তখন তিনি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ফয়ছালাহ্‌র দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : "যাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য করা হয়েছে তার জন্যে অঙ্গীকার নেই।" অর্থাৎ বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে যে বাইআত আদায় করা হয়েছে অথবা ভয়ের কারণে লোকেরা যে বাইআত করেছে তা আদৌ বাইআত নয়, অতএব, তা রক্ষা করা অপরিহার্য নয় এবং তা ভঙ্গ করলে গুনাহ্ হবে না। তাঁর এ ফত্ওয়ার ভিত্তিতে বহু লোক মানছূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইমাম নাফসে যাকীয়্যাহ্ (রাহ্ঃ)-এর সাথে জিহাদে যোগদান করেন। এ ফত্ওয়া দেয়ার কারণে ইমাম মালেককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর শরীর থেকে পোশাক খুলে নিয়ে তাঁকে চাবূক মারা হয়। এর ফলে কাঁধ থেকে তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।]অবশ্য পরে তিনি) হয়তোবা জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে (মানছূরের সাথে আপোস করেন ও তার সাথে সহযোগিতা করেন।[

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ব ('আঃ) ক্ষমতাসীন স্বরশাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলে ও হুকুমতের ওপর স্বীয় দাবী উপস্থাপন করলে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও হযরতে ইমাম মালেক একইভাবে তা সমর্থন করতেন, যদিও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)-এর পরবর্তী আহলে বাইতের ইমামগণ ('আঃ) হুকুমতের ওপর স্বীয় অধিকারের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বাছীরাত্ দ্বারা পর্যালোচনা করে নিজ নিজ সমকালীন পরিস্থিতিকে বি বের পতাকা উত্তোলনের জন্য উপযোগী মনে করেন নি এবং সশস্ত্র যুদ্ধকে তখনকার পরিবেশে ইসলামের স্বার্থের জন্য সহায়ক গণ্য করেন নি বলে জিহাদ ঘোষণা করেন নি।

হযরত ইমাম শাফেঈ ও হযরত ইমাম আহমা ইবনে হাম্বালও আহলে বাইত ('আঃ)কে ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রাখতেন। আর এ জন্য তাঁদের উভয়কেই আহলে বাইতের ('আঃ) প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আহলে বাইতের ('আঃ) প্রতি ভালোবাসা পোষণের কারণে ইমাম শাফেঈকে "রাফেযী" ('শিয়া' বুঝাতে গালি) বলে অভিহিত করা হয় এবং ইমাম আহমা ইবনে হাম্বালের গৃহে তল্লাশী চালানো হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ সহ আহলে সুন্নাতের চার ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় দ্বীনী মনীষীগণের অনেকেই আহলে বাইত ('আঃ) সম্পর্কে, বিশেষ করে আহলে বাইতের ইমামগণ ('আঃ) সম্পর্কে স্বীয় কথা ও কাজে যে সম্মান, স ম ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন তা কী প্রমাণ করে? তাঁরা কি সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলোর ভিত্তিতে এবং ইমামগণের ('আঃ) 'ইলম্ ও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেরকে 'আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম' বলে গণ্য করতেন, কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করাকেই নিজেদের জন্য কল্যাণকর বিবেচনা করেছিলেন? নাকি এ ব্যাপারে অকাট্য 'আক্বীদায় উপনীত হতে না পারলেও এমনটি হবার সম্ভাবনায় 'সতর্কতার নীতি' অনুযায়ী তাঁদের প্রতি সম্মান, স ম ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন?

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্ঃ) সহ আহলে সুন্নাতের ইমামগণ ফিক্বহী বিষয়াদিতে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করলেও বর্তমানে মাযহাব্ বলতে যা বুঝায় সেভাবে তাঁরা নিজেরা কোনো মাযহাবের প্রচলন করে যান নি। বরং পরবর্তীকালে তাঁদের নামে মাযহাবের প্রচলন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আহলে সুন্নাতের ইমামগণ তাঁদের সমসাময়িক রাজতান্ত্রিক স্বরাচারী সরকারগুলোর বিরোধী ছিলেন এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানানোর ও আহলে বাইতের সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁদেরকে হত্যা, নির্যাতন বা হয়রানির শিকার হতে হয়।]বিশেষ করে

হযরত ইমাম আবূ হানীফাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইমাম মালেককে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এছাড়া ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমা ইবনে হাম্বাল্ হয়রানির শিকার হন।[আর এ কারণে তাঁদের কেউ কেউ, স্বীয় বিবেচনায়, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে, সরকারের সাথে বাহ্যতঃ সমঝোতার নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে তাঁদের শিষ্য- শাগরিদগণ তাঁদের নামে বিভিন্ন মাযহাবের প্রচলন করে স্বরাচারী সরকারগুলোর সাথে সার্বিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে, আহলে বাইতের ইমামগণের ('আঃ) সাথে ক্ষমতাসীনদের দুশমনীর প্রেক্ষাপটে দলীয় অনুভূতি ও শিয়া- সুন্নী পার্থক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তৃতীয়তঃ চার সুন্নী মাযহাব্ যে ইমামগণের নামে প্রবর্তিত হয়েছে তাঁদের প্রত্যকের ইন্তেকালের পরে বহুলাংশে তৎকালীন সরকারগুলোর সাথে ঐ সব মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় 'আলেমগণের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রভাবেই পরবর্তীকালে ফিক্বহী ক্ষেত্রে আহলে বাইতের ('আঃ) সাথে এ সব মাযহাবের পার্থক্য ব্যাপকতর হয়ে ওঠে।

[এ সব পার্থক্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এক বঠকে প্রদত্ত তিন তালাক্বকে চূড়ান্ত তালাক্ বলে গণ্যকরণ অন্যতম, অথচ মশহূর এই যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্ঃ) একে এক বার তালাক্ বলে গণ্য করতেন। স্মর্তব্য, ইমাম আবূ হানীফাহর নামে হানাফী মাযহাব্ প্রবর্তন করা হলেও এ মাযহাবের মূল নায়ক ছিলেন ক্বাযী আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বিন্ হাসান্ শায়বানী। স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফাহর ফিক্বাহ্ কী ছিলো তা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রেই জানা যায় না। অনেকের ধারণা, ক্বাযীর চাকরি গ্রহণ না করার কারণে নয়, বরং হযরত ইমাম জা'ফা ছাদেক্ ('আঃ)কে ইমাম হিসেবে স্বীকার করার কারণেই তাঁকে কারারুদ্ধ ও হত্যা করা হয়।]

চতুর্থতঃ একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের ('আঃ) ইমামগণের অনুসারীদেরকে সুন্নাতে রাসূল (ছ্বাঃ)- এর অনুসারী নয় বলে জনমনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে "আহলে সুন্নাত্ ওয়াল্ জামা'আত্" নাম তরী করা হয় এবং সে নামে চার মাযহাবকে অভিহিত করা হয়।

পঞ্চমতঃ “ছিহাহ্ সিত্তাহ্” নামে পরিচিত হাদীছ-গ্রন্থ সমূহ সহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য হাদীছ-গ্রন্থ হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও হযরত ইমাম মালেকের শতাব্দীকাল পরে বা তারও বেশী পরে সংকলিত হলেও সেগুলোকে গ্রহণ করার ফলে শিয়া-সুন্নী ব্যবধান আরো বেশী ব্যাপকতা লাভ করে। [বলা বাহুল্য যে, “ছিহাহ্ সিত্তাহ্” বিশেষণটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কারণ, বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় অনুযায়ী বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বর্ণনাস্তরসংখ্যা যতো বেশী হবে তথ্যবিকৃতির আশঙ্কাও ততো বেশী থাকে এবং বর্ণনাস্তরসংখ্যা যতো কম হবে নির্ভরযোগ্যতার সম্ভাবনাও ততো বেশী হবে। এ কারণেই সুন্নী ধারার হাদীছ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে হযরত ইমাম মালেক কর্তৃক সংকলিত “মুওয়াত্ত্বা”র হাদীছ সমূহে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীছ সমূহের তুলনায় জাল হাদীছের অনুপ্রবেশ এবং বিকৃতি, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম ছিলো, (তাই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলাভী “মুওয়াত্ত্বা” কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীছ-গ্রন্থ বলে গণ্য করতেন) যদিও “মুওয়াত্ত্বা” ও ভুলভ্রান্তির উর্ধে ছিলো না। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে “মুওয়াত্ত্বা” কে “ছহীহ্ নয়” বলে জনমনে ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরবর্তী কালে ছয়টি হাদীছ-সংকলনকে “ছিহাহ্ সিত্তাহ্” (ছয়টি ছহীহ্) বলে চিহ্নিত করা হয়, যদিও সেগুলো “মুওয়াত্ত্বা” সংকলনের শতাব্দী কালেরও বেশী পরে সংকলিত হয়।] বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ যেখানে ফিক্বহী ব্যাপারে খবরে ওয়াহে হাদীছকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন না, সেখানে পরবর্তীকালে খবরে ওয়াহে হাদীছ ব্যাপকভাবে গ্রহণের ফলে বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের চেহারা অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য তী তর হয়ে ওঠে।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, উমাইয়াহ্ ও ‘আব্বাসী যুগে অসংখ্য জাল হাদীছ রচিত হওয়া এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের শতাব্দীকালেরও বেশী সময় পরে অনেকগুলো স্তরের নামে বর্ণিত খবরে ওয়াহে জাল ও ছহীহ্ হাদীছের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পার্থক্য করতে পারা ‘অসম্ভব’ না হলেও ‘প্রায় অসম্ভব’ ছিলো, বিশেষ করে হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্ঃ) তা অসম্ভব মনে করতেন বলেই তা গ্রহণ করেন নি। এ থেকে আরো শতাব্দীকাল পরে সংগৃহীত

হাদীছ সমূহের অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে। বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সিংহ ভাগের জন্যই জাল হাদীছ দায়ী।

[এ প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে, খবরে ওয়াহে হাদীছকে চোখ বুঁজে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, বরং ইসলামের চারটি অকাট্য জ্ঞানসূত্র গ্রহণের পরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সে সবের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে খবরে ওয়াহে হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, চার অকাট্য জ্ঞানসূত্র গ্রহণ করার পর 'আক্বাএদের শাখা- প্রশাখা এবং ফরয ও হারাম সহ কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই জবাববিহীন থাকে না; কেবল কতক গৌণ ও খুটিনাটি (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) এবং প্রায়োগিক বিষয় অবশিষ্ট থাকে। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে উক্ত চার জ্ঞানসূত্রের ব্যবহার ও তার ভিত্তিতে খবরে ওয়াহে হাদীছ পরীক্ষা করা যতোখানি সহজ তৎকালে তা অতো সহজ ছিলো না।

এ প্রসঙ্গেই আরো উল্লেখ করতে হয় যে, অনেক পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাতের ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত "আহলে হাদীছ" নামক ফিরক্বাহর অনুসারীদের অনেকে হানাফীদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কথা মানে না, আবূ হানীফাহর কথা মানে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কথা বলে দাবীকৃত কথা ও প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কথা কখনোই এক নয় এবং ইমাম বুখারী সহ হাদীছ সংকলকগণের বিচারক্ষমতার ওপরে অন্ধভাবে আস্থা পোষণের পক্ষে কোনো দলীল নেই, বিশেষ করে তাঁরা যখন না মা'ছূম্ ছিলেন, না অকাট্যভাবে ঐশী ইলহামের অধিকারী ছিলেন, না রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর নিকটবর্তী কালের ছিলেন, বরং তাঁদেরকে হাদীছের ব্যাপারে অনেকগুলো স্তরের বর্ণনাকারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো যেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁদের পক্ষে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিলো না।]

ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টানো কেন

অনেককেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের বিরোধ- বিসম্বাদ সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলো ও ানোর বিরোধিতা করতে দেখা যায়। তাঁদের মতে, এর ফলে কেবল মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ- অনৈক্যই বৃদ্ধি পাবে এবং তা ফিরক্বাহ্ ও মাযহাবের উর্ধে উঠে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার বিষয়টিকে সুদূরপরাহত করে তুলবে।

আসলেও ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের তিক্ত বিষয়গুলোর স্মৃতিচারণ না করাই ভালো। প্রথমতঃ এর সাথে যারা জড়িত তাঁদের কেউই বেঁচে নেই এবং এখন ইতিহাসকে বদলে দেয়া যাবে না। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হাযির হবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যেমন এরশাদ করেছেন :

(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

" তারা ছিলো একটি জনগোষ্ঠী যারা অতীত হয়ে গিয়েছে; তারা (ভালো) যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্য এবং তারা (মন্দ) যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই ওপরে আপতিত হবে। আর তারা যা কিছু করেছে সে জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৩৪)

দ্বিতীয়তঃ শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যে বারো জন বুযুর্গ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম বলে 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে তাঁদের মধ্য থেকে এগারো জন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যকার দ্বাদশ ইমাম- শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যাকে ইমাম মাহদী ('আঃ) বলে 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে, তাদের 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করলেও তিনি আল্লাহর ইচ্ছায়ই আত্মপরিচয় গোপন করে আছেন এবং উপযুক্ত সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন।

যেহেতু শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানই হযরত ইমাম মাহদী ('আঃ)- এর আবির্ভাব ও তাঁর দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে, সেহেতু তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন কি করেন নি এ প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর আত্মপ্রকাশের পর তাঁকে গ্রহণ- বর্জনের ওপরই যে কারো হেদায়াত ও গোমরাহী নির্ভর করবে। কিন্তু এখন যেহেতু উক্ত বারো জন বুযুর্গ ব্যক্তির কেউই আমাদের সামনে ইমামতের দাবী নিয়ে উপস্থিত নন, এমতাবস্থায় তাঁদের ইমামত নিয়ে বিতর্ক প্রধানতঃ একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক ব নয়, যদিও শারীআতের গৌণ বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদ হাদীছ ও রেওয়াইয়াত্ গ্রহণের ব্যাপারে এর

ভূমিকা আছে। এর মানে হচ্ছে, ইমামতের 'আক্বীদাহ্ পোষণ করলে যে কোনো হাদীছ ও রেওয়াইয়াতের রাভী (বর্ণনাকারী) বিচার শুরু হবে মা'ছূম্ ('আঃ)- এর পর থেকে।

অবশ্য এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আসলেই আমাদের উচিত অতীত হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আমলের সাথে নিজেদেরকে না জড়ানো। কারণ, আমাদের বিতর্ক তাঁদের আমলের ভালো- মন্দ কোনো কিছুতেই কিছু াস- বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যখন নিজেদেরকে তাঁদের 'আমলের সাথে জড়িয়ে ফেলি তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের 'আমলের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বিশেষ করে অনেক সময় বলা হয় যে, অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ও অতীতের মনীষীগণ ইসলাম সম্পর্কে ও কোরআন মজীদের তাৎপর্য আমাদের চেয়ে কম বুঝতেন না। অথচ এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা না মা'ছূম্ ছিলেন, না অকাট্যভাবে ঐশী ইলহামের অধিকারী ছিলেন। অতএব, তাঁদের পক্ষে ভুল করা সম্ভব এবং পূর্বোল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী, তাঁরা ভুল করে থাকলে আমাদের জন্য তার অনুসরণ করা উচিত হবে না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কথা ও কাজের বর্ণনা কতোখানি সঠিকভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা- ও প্রশ্নের উর্ধে নয়।

আরো বলা হয় যে, আমরা তো কোরআন মজীদ ও ইসলাম ছাহাবীদের মাধ্যমেই পেয়েছি, সুতরাং তাঁদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমরা কোরআন ও ইসলাম তাঁদের ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে পাই নি, বরং মুতাওয়াতি সূত্রে 'তাঁদের সকলের কাছ থেকে' পেয়েছি- যার নির্ভুলতা ও গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীত। এর সাথে যে সব বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক মতপার্থক্য ছিলো সে সব বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে নির্ভুল গণ্য করা ঠিক হবে না। আর ইসলাম ও কোরআন মজীদকে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই যে তাঁরা তা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের তুলনায় অধিকতর সঠিকভাবে বুঝেছিলেন এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জ্ঞানপূর্ণ কথা

অনেক সময় কেউ এমন ব্যক্তির কাছে বহন করে নিয়ে যায় যে বহনকারীর তুলনায় অধিকতর সমঝদার।

[হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্ ’ উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এরশাদ করেছেন :

نَضَّرَ اللهُ عَبداً سَمِعَ مَقالَتی فَحَفِظَها و وَعاها وَأدَّها کَما سَمِعَها فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوعی لَها مِن سامِعٍ.

“আল্লাহ্ চিরসতেজ করে রাখুন (তাঁর) সেই বান্দাহকে যে আমার কথা শুনলো, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রাখলো ও স্মরণ রাখলো এবং তা যেভাবে শুনলো হুবহু সেভাবেই (অন্যের কাছে) পৌঁছে দিলো; আর অনেক সময় এমন হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যার কাছে তা পৌঁছেছে সে তা (আমার কাছ থেকে) শ্রবণকারীর তুলনায় উত্তমরূপে গ্রহণ করেছে।” (আবূ দাউদ; তিরমিযী)

বস্তুতঃ আমরা যদি বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য ইসলামের সর্বজনগ্রহণযোগ্য চারটি অকাট্য সূত্রের ওপর নির্ভর করে তার দাবী অনুযায়ী আমাদের জীবনে সকল ক্ষেত্রে চলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মনীতি ও বিধিবিধান লাভের ও তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করতাম তাহলে উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক বিতর্ক এমনিতেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু আমরা তা না করার কারণেই এ বিতর্কের উপযোগিতা থেকে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। কারণ, বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতি হাদীছ ও ইজমা’এ উম্মাহর মানদণ্ডে যেখানে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং জ্ঞানগত যোগ্যতার সাথে পবিত্রতা ও পাপমুক্ততা যুক্ত হওয়ার কারণে কেবল তাঁদের কাছ থেকেই নির্ভুল দ্বীনী জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে, এমতাবস্থায় আমরা যদি অন্য কারো কাছ থেকে এ সব মানদণ্ডের কোনো না কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ফয়ছালাহ্ মেনে না চলতাম এবং তার ওপরে একগুঁয়েমি না করতাম তাহলে আজ আর ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন হতো না।

উদাহরণস্বরূপ এক বঠকে তিন তালাক্ সংক্রান্ত ফত্ওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে ফেরতযোগ্য তালাক্ব (طلاق رجعى) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন যে, الطلاق مرتان- তালাক্ব দুই বার (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২২৯) অতঃপর ভালোভাবে রাখতে হবে অথবা (তৃতীয় দফা তালাক্ দিয়ে) ভদ্রভাবে বিদায় করে দিতে হবে (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২২৯) এমতাবস্থায় কেউ যে কোনো কথা বলেই (যেমন : 'তিন তালাক্ব ' শব্দ উচ্চারণ করে বা 'তালাক্ব ' শব্দটি তিন বার পুনরাবৃত্তি করে) স্ত্রীকে তালাক্ব দিক না কেন, অবশ্যই তা 'এক বার ' ও ফেরতযোগ্য তালাক্ব হবে। অতঃপর সে তার ঐ তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তার পক্ষে ঐ স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার তালাক্ব দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম বার তালাক্ব দেয়ার সাথে সাথেই সে আর তার স্ত্রী থাকলো না এবং যে সব কাজের দ্বারা 'তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা ' প্রমাণিত হয় এমন কোনো কাজের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে এনে স্ত্রীর মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আগে তাকে 'দ্বিতীয় বার ' তালাক্ব দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও কেবল দ্বিতীয় খলীফাহ্র মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যকার বৃহত্তর অংশের মধ্যে এক বঠকে প্রদত্ত 'তিন তালাক্ব ' কে ফেরত- অযোগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বলে গণ্য করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মশহূ মত অনুযায়ী, স্বয়ং হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্ঃ)- যার নামে হানাফী মাযহাবের প্রচলন করা হয়েছে- যেখানে এক বঠকে প্রদত্ত 'তিন তালাক্ব ' কে ফেরতযোগ্য 'এক বার ' তালাক্ব বলে গণ্য করতেন সেখানে পরবর্তীকালে 'হানাফী মাযহাবের মত ' নামে প্রদত্ত ফত্ওয়া হচ্ছে এই যে, এক বঠকে প্রদত্ত 'তিন তালাক্ব ' ফেরত- অযোগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বলে গণ্য হবে। আর এর ফলে যে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে মানুষের জীবনের জন্য প্রদত্ত প্রশস্ততা ও সহজতা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে শুধু তা- ই নয়, বরং উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে অনেককে কঠিন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হবার পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

[বাংলাদেশে (এবং হয়তো আরো কোথাও কোথাও) অনেক লোক রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক বঠকে 'তিন তালাক্ব' দেয়ার পর জীবনের প্রয়োজনে, বিশেষতঃ সন্তানদের কারণে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'হীলা'র (শব্দটি আরবী হলেও ফার্সী ভাষায় 'প্রতারণা' অর্থে ব্যবহৃত হয়) আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

যেহেতু চূড়ান্ত তালাক্বের পর তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ও সে স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা সে স্বামী কর্তৃক তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে বিবাহ করার সুযোগ নেই এবং যেহেতু নতুন স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা তার পক্ষ থেকে ঐ স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়ার কোনোই নিশ্চয়তা থাকে না সেহেতু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আপোসে কোনো ব্যক্তিকে এ শর্তে ঐ নারীকে বিবাহ করার জন্য রাযী করানো হয় যে, বিবাহের পর স্বামী- স্ত্রী মাত্র এক রাতের জন্য একত্রবাস করার পরই নতুন স্বামী তাকে তালাক্ব দেবে।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের বিবাহ ইসলামের কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতেই ছহীহ্ নয়। কারণ, প্রকাশ্য বা গোপন যে কোনোভাবেই হোক না কেন তালাক্ব দেয়ার পূর্বশর্ত বিশিষ্ট বিবাহ ইসলামসম্মত কোনো বিবাহের আওতায় পড়ে না। এ ধরনের বিবাহ না স্থায়ী বিবাহ, না অস্থায়ী বিবাহ। ইসলামের সকল ফিরক্বাহ্ ও মাযহাবের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী কেবল স্থায়ী বিবাহের পরেই এ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক্বের পরে পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহিত হতে পারবে। এমতাবস্থায় স্থায়ী বিবাহ হিসেবে পাতানো এই তথাকথিত বিবাহ সুস্পষ্টতঃই ব্যভিচার ব নয়। কারণ, যেহেতু অস্থায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে অস্থায়ী হিসেবেই ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে 'আক্ব পড়ানো হয় এবং মেয়াদশেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিবাহের সমাপ্তি ঘটে; তালাক্ব দেয়ার প্রয়োজন হয় না, সেহেতু এ ধরনের পাতানো বিবাহ 'অস্থায়ী বিবাহ'ও নয়।

অন্যদিকে যারা এ ধরনের হীলা (প্রতারণা)র ঘৃণ্য নাজায়েয কাজ হওয়ার কারণে এর আশ্রয় গ্রহণ করে না প্রচলিত ফত্ওয়ার কারণে তারা তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ফলে অনেক সময় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ওপর অন্ধকার নেমে আসে- যা আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় নয় বলেই তিনি দু'- দুই বার তালাক্বের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছেন।]

এখানে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। এভাবে অনেক ছাহাবীর- যাদের নিষ্পাপ হওয়ার সপক্ষে কোনোই দলীল নেই- মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে- যা মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

আজকের করণীয়

ইসলামের দৃষ্টিতে আজকের দিনে মুসলমানদের দ্বীনী সমস্যাবলীকে তিনটি সমস্যার মধ্যে সমর্ িত করা যায়; তাদের অন্যান্য পার্থিব ও অপার্থিব সমস্যাবলী এ তিনটির কোনোটি না কোনোটির আওতাভুক্ত এবং উক্ত তিনটি সমস্যার সমাধান হলে অন্যান্য সমস্যার সমাধানও খুব সহজেই সম্ভব হবে। এ তিনটি সমস্যা হচ্ছে 'আক্বাএদের সমস্যা, ফিক্বহী সমস্যা এবং নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের সমস্যা।

ইসলাম তার মৌলিক 'আক্বাএদের (اصول دين) ক্ষেত্রে কোনোরূপ অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয় নি- যা বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করে নিয়েছে। বরং ইসলাম তার মৌলিক 'আক্বাএদের তিনটি বিষয়কে অর্থাৎ তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাত্- কে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় সর্বজনীন মানদণ্ড বিচারবুদ্ধি (عقل)- এর ওপর ভিত্তিশীল করেছে- যাতে কারো জন্য নিজ নিজ অন্ধ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকার পক্ষে কোনো দলীল না থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে বার বার 'আক্বল্- এর আশ্রয় গ্রহণের জন্য সকল মানুষের প্রতি আহবোন জানিয়েছেন এবং যারা 'আক্বল্- এর আশ্রয় গ্রহণ করে না তাদেরকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অস্তিত্ব ও তাওহীদ, আখেরাত এবং নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের ঐশী গ্রন্থ্ হওয়ার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অতএব, মুসলমানদেরকে ইসলামের উছূলে 'আক্বাএদকে 'আক্বলী দলীলের ভিত্তিতে নতুন করে জানতে ও গ্রহণ করতে হবে এবং অমুসলিমদেরকে এরই ভিত্তিতে ইসলামের দিকে আহবান করতে হবে।

অতঃপর 'আক্বাএদের বিস্তারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোরআন মজীদকে ও তার সহায়ক ব্যাখ্যাকারী শক্তি হিসেবে 'আক্বল্- কে এবং মুতাওয়াতি হাদীছ সমূহ ও ইজমা'এ উম্মাহকে (প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যকার মতৈক্যকে, কোনো ফিরক্বাহ্ বা মাযহাব বিশেষের ইজমা'কে নয়) গ্রহণ করতে হবে। হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সর্বশেষ নবী হওয়া, কোরআন মজীদের সর্বশেষ এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত ঐশী কিতাব হওয়া, আর রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ততার বিষয়গুলো এ সব সূত্র থেকেই অকাট্যভাবে পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, 'আক্বাএদের মূল বিষয় সমূহ ও শাখা- প্রশাখা সমূহ এবং মূল ও গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব অর্থাৎ ফরয ও হারাম সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপরোক্ত চারটি মৌলিক দ্বীনী সূত্র থেকেই পাওয়া যায়; অতঃপর উপরোক্ত চার সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) এবং প্রায়োগিক বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদ হাদীছ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এগুলোর ও এ নীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং যে সব ফিরক্বাহ্ ও মাযহাব ইজতিহাদের দরযাহ্ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করে তাদেরকে সে দরযাহ্ পুনরায় খুলে দিতে হবে। কারণ, ইসলামে ইজতিহাদের বধতা থাকলে- যার বধতার ব্যাপারে সকলেই একমত- তার দরযাহ্ কেউ কখনো বন্ধ করতে পারে না। বিশেষ করে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে মুসলিম সমাজে ইজতিহাদের অস্তিত্ব থাকা ফরযে কেফায়ী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)

"কেন এমন হলো না যে, তাদের (মু'মিনাদের) প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কতক লোক বেরিয়ে পড়বে এবং দ্বীনের গভীর সমঝ অর্জনের পর যখন স্বীয় ক্বওমের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে যাতে তারা (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) বেঁচে থাকে।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ : ১২২)

অন্যদিকে যাদের মধ্যে ইজতিহাদ অব্যাহত রয়েছে তাদেরকে পূর্ব থেকে চলে আসা ইজতিহাদের মূলনীতি ও জ্ঞানসূত্রসমূহ সম্পর্কে সব সময়ই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ছাহাবীগণ সহ সকল স্তরের হাদীছ বর্ণনাকারীগণ ও অতীতের মনীষীগণের কেউই মা'ছূম্ ছিলেন না, সুতরাং তাঁদের মধ্যেও ভুল ও দুর্বলতা থাকতে পারে। বিশেষ করে তাঁদের কারো কোনো মত বা বর্ণনা যদি কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের সাথে বা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর মত বলে ইয়াক্বীন সৃষ্টি হয় এমন কোনো মতের সাথে অথবা 'আক্বল্- এর অকাট্য রায় বা উম্মাহর প্রথম যুগের মতৈক্যের কোনো বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সে ক্ষেত্রে কিছুতেই তাঁর সে মত বা বর্ণনা

গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বা অন্য কোনো মা'ছূমের ('আঃ) মত বলে দাবী করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বা অন্য কোনো মা'ছূমের ('আঃ) মত নয়, বরং তা মিথ্যা রচনা বলে গণ্য করতে হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ক্বিয়াস্ নিয়ে বিতর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য যে, কোরআন ও সুন্নাতে রাসূল (ছ্বাঃ)- এর মোকাবিলায় ক্বিয়াস্- এর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে এর বাইরে ক্বিয়াস্- এর গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা তা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য বিষয়।

প্রকৃত পক্ষে ওপরে যে, চারটি সর্বসম্মত অকাট্য দ্বীনী সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে চূড়ান্ত ও বিতর্কাতীত সূত্র হিসেবে এবং সেই সাথে এ চার মানদণ্ডের বিচারে উৎরে যাওয়া খবরে ওয়াহে হাদীছ সমূহকে পঞ্চম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হলে এগুলোর সাহায্যে সমাধান করা যাবে না এমন কোনো দ্বীনী জিজ্ঞাসা থাকতে পারে না।

এমতাবস্থায় মুজতাহিদের কাজ হবে উপরোক্ত সূত্রসমূহ নিয়ে গবেষণা করে নবজাগ্রত বা বিতর্কিত সমস্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ছ্বাঃ) ফয়ছালাহ্ উদঘাটন করা। অতঃপর আর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এতদসত্ত্বেও আমরা যদি ধরে নেই যে, আরো কিছু প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং তার সমাধানের জন্য ক্বিয়াসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তো সে সব প্রশ্ন হবে খুবই গৌণ বিষয়াদিতে- মুস্তাহাব ও মাকরূহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে। এর ফলে ক্বিয়াসের ক্ষেত্র খুবই সীমিত হয়ে আসবে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফিক্বহী মতপার্থক্যও প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে, অন্ততঃ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই মতপার্থক্য থাকবে না।

বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে যে সব ফিক্বহী মতপার্থক্য রয়েছে তার বেশীর ভাগেরই কারণ হচ্ছে সরাসরি কোরআন মজীদ থেকে ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব সন্ধানে যথাযথ প্রচেষ্টা না চালানো এবং এ ব্যাপারে খবরে ওয়াহে হাদীছ ও অতীতের মনীষীদের ওপর অনেক বেশী মাত্রায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্ধভাবে নির্ভরতা, অথচ হাদীছের রাভীগণ ও সংকলকগণ এবং অতীতের মনীষীগণ না মা'ছূম্ ছিলেন, না সরাসরি ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে কোরআন মজীদকে 'সকল জ্ঞানের আধার ' (تبياناً لكل شيء) বলে উল্লেখ করেছেন

সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী সমস্যা তথা ফরয ও হারাম সংক্রান্ত কোনো সমস্যাই সমাধানবিহীন থাকতে পারে না।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 'আক্বাএ - কে ওপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণ করার পর কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করা হলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী সমস্যাই সমাধানবিহীন থাকে না। ওযূ, তালাক্ব, অস্থায়ী বিবাহ, ওয়াছীয়্যাত, ইফতারের সময় ও কোনো কোনো মীরাছী বিষয় সহ যে সব গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে তার সবগুলোর সমাধানই কোরআন মজীদে নিহিত রয়েছে; 'আক্বল্, মুতাওয়াতি হাদীছ ও ইজমা'এ উম্মাহর সাহায্য নিয়ে এর সবগুলোই উদঘাটন করা সম্ভব।

অবশ্য কোরআন মজীদ থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানগত, কালগত, ভাষাগত ও পরিবেশগত ব্যবধানের কারণে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা অপরিহার্য এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানগবেষক (মুজতাহিদ)গণকে কোরআন নাযিলের যুগের আরবী ভাষার জ্ঞানের সাথে সাথে সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকরণে সহায়ক শাস্ত্রসমূহেরও (যেমন : জ্ঞানতত্ত্ব, তাৎপর্যবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শন) আশ্রয় নিতে হবে।

উপরোক্ত চার মৌলিক সূত্র থেকে ফিক্বহী জিজ্ঞাসাবলীর জবাব সন্ধান করা হলে এরপর মাত্র কতক গৌণ বিষয়ই অবশিষ্ট থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণকে ('আঃ) প্রেরণ করেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে পরিচিত করানো এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ও হারামগুলো সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়া। এমতাবস্থায় এটা সম্ভব নয় যে, একজন রাসূল এ সম্পর্কে তাঁর স্বল্পসংখ্যক ছাহাবীকে জানাবেন, বরং এ ধরনের আহকাম বিপুল সংখ্যক ছাহাবীর জানা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের সময় তাঁর ছাহাবীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক, সুতরাং খবরে ওয়াহে হাদীছের দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমাণিত হতে পারে না। অবশ্য বিস্তারিত তথা খুটিনাটি, বিশেষতঃ প্রায়োগিক

বিধান ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহে হাদীছ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে উপরোক্ত চার সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার ওপরে।

বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আহকামের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ (মা'ছূম্) ব্যক্তিত্ববর্গের কথা ও কাজ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া মুসলমানদের কর্তব্য, কিন্তু কোনো হাদীছ গ্রন্থে কোনো কিছু মা'ছূমের কথা বা কাজ হিসেবে উল্লেখ থাকা মানেই যে সত্যি সত্যিই তা মা'ছূমের কথা ও কাজ এটা নিশ্চিত করে বলা চলে না। বরং একজন মুজতাহিদ যে কোনো খবরে ওয়াহে হাদীছকে উপরোক্ত চার দলীলের মানদণ্ডে ও হাদীছ বিচারের আরো বহু মানদণ্ডে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে যখন এ প্রত্যয়ে উপনীত হবেন যে, তা সত্যি সত্যিই মা'ছূমের কথা বা কাজ কেবল তখনি তিনি তা গ্রহণ করবেন।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, কোনো হাদীছের ক্ষেত্রে মা'ছূম্ ও হাদীছ- সংকলকের মাঝে বর্ণনাস্তরের (রাভী) সংখ্যা যতো কম হবে হাদীছে ভ্রান্তি বা বিকৃতি প্রবেশ বা পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ততোটা কম এবং বর্ণনাস্তরের আধিক্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি, বিকৃতি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা ততো বেশী। মোদ্দা কথা, শিয়া ও সুন্নী নির্বিশেষে কোনো ধারার কোনো হাদীছ- গ্রন্থেরই সকল হাদীছকে চোখ বুঁজে গ্রহণ বা চোখ বুঁজে প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই।

বস্তুতঃ 'আক্বাএদী ও ফিক্বহী উভয় ক্ষেত্রেই শিয়া- সুন্নী দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হচ্ছে হয় ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করা, নয়তো বধ গণ্য করা সত্ত্বেও অতীতের ইজতিহাদ সমূহকে যথেষ্ট গণ্য করে ইজতিহাদের দরযাহ্ বন্ধ গণ্য করা। বাছ- বিচার না করে অন্ধভাবে খবরে ওয়াহে হাদীছ গ্রহণ করার কারণও তা- ই। ইজতিহাদ অব্যাহত থাকলে এর ধারাক্রমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এক সময় হাদীছের ক্ষেত্রে এ ভ্রান্ত কর্মনীতির বিলুপ্তি ঘটতে বাধ্য। তাই দেখা যায়, যারা ইজতিহাদ করছেন তাঁরা বহুলাংশে এ অন্ধত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। সুন্নীদের মধ্যে যেমন আহলে হাদীছ নামে পরিচিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফিরক্বাহ্ ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করে, তেমনি শিয়াদের মধ্যেও আখবারী নামে পরিচিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফিরক্বাহ্ ইজতিহাদকে অবৈধ গণ্য করে। অন্যদিকে উছূলী নামে পরিচিত

বেশীর ভাগ শিয়াদের মধ্যেই ইজতিহাদ প্রচলিত আছে এবং এ ধারার মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সুন্নী ধারার হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বাহ্ থেকেও সাহায্য নিয়ে থাকেন এবং দেখা গেছে যে, একজন শিয়া মুজতাহিদ কতক ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে চলে আসা পূর্ববর্তী খ্যাতনামা মুজতাহিদগণের ফত্ওয়া পরিত্যাগ করে সুন্নী ধারার মধ্যে প্রচলিত ফত্ওয়ার অনুরূপ ফত্ওয়া দিয়েছেন, কিন্তু এ কারণে তাঁকে কোনোরূপ বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয় নি।

[উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোরআন মজীদের আয়াত

(انما المشركون نجس)

“ অবশ্যই মুশরিকরা অপবিত্র। ” (সূরাহ্ আত্- তাওবাহ্ : ২৮)

এ আয়াতের ভিত্তিতে শিয়া মাযহাবের মুজতাহিদগণের বেশীর ভাগেরই ফত্ওয়া হচ্ছে এই যে, মূলগতভাবে যে খাবার হালাল তা- ও মুশরিকের দ্বারা প্রস্তুত হলে খাওয়া জায়েয নয়। যদিও অতীতের কতক শিয়া মুজতাহিদ জায়েয বলেছেন, তবে সাধারণভাবে শিয়া মাযহাবের অনুসারীগণ নাজায়েয হওয়ার ফত্ওয়া অনুযায়ীই আমল করে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ক্বোমের দ্বীনী শিক্ষাকে র অন্যতম শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মাদ জান্নাতী (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত আয়াতুল্লাহ্ আহমাদ জান্নাতী নন) তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে এ বিষয়ে শিয়া- সুন্নী উভয় ধারার হাদীছ ও মুজতাহিদগণের ফত্ওয়া পর্যালোচনা করে সুন্নী ফত্ওয়ার অনুরূপ উপসংহারে উপনীত হন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতে শারীরিক অপবিত্রতার (نجاسة جسمانى) কথা বলা হয় নি, বরং আত্মিক অপবিত্রতার (نجاسة روحانى) কথা বলা হয়েছে, অতএব, বাহ্যতঃ নাপাকীর প্রমাণ বা নিদর্শন না থাকলে হালাল খাবার মুশরিকের দ্বারা প্রস্তুত হলেও তা হালাল। প্রবন্ধটি ক্বোমের দ্বীনী জ্ঞানকে র মুখপত্র کیهان اندیشهতে প্রকাশিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে কোনো মহল থেকেই কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নি।]

এ পর্যায়ে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে মুসলমানদের শাসন- কর্তৃত্বের বিষয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ক প্রশ্নটির জবাব সবচেয়ে সহজ বলে মনে করি। কারণ, ছাহাবীদের যুগ অনেক আগেই গত হয়ে গিয়েছে এবং শিয়া মাযহাবের অনুসারীগণ যে বারো জন পবিত্র ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম বলে 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে তাঁদের মধ্যে এগারো জন অনেক আগেই এ পার্থিব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং শিয়া 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই দ্বাদশ ইমাম [ইমাম মাহদী ('আঃ)] স্বীয় পরিচিতি ও দাবী সহকারে সমাজে বিচরণ করছেন না, বরং স্বীয় পরিচিতি গোপন করে অবস্থান করছেন। ফলে তাঁর নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের দাবী কার্যতঃ মেনে নেয়া বা না মানার প্রশ্নটি আপাততঃ বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় রা ীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে শিয়া- সুন্নী উভয় ধারার মুসলমানরাই অভিন্ন অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে।

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, হযরত ইমাম মাহদী ('আঃ)- এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বর্তমান অন্তর্বর্তীকালে মুসলমানদের শাসনকর্তৃত্বের ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে যারা মা'ছূম্ না হলেও ইতিপূর্বে উল্লিখিত দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য তিনটি গুণের অধিকারী। বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব কেবল মুজতাহিদগণের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। আর কোরআন- সুন্নাহর দাবীও এটাই। কারণ, ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে বর্ণিত এমন একটি হাদীছ হচ্ছে :

العلماء ورثة الانبياء.

"আলেমগণ নবী- রাসূলগণের ('আঃ) উত্তরাধিকারী।"

আর বলা বাহুল্য যে, এ হাদীছে "আলেম" বলতে বর্তমান যুগে প্রচলিত পরিভাষায় ঢালাওভাবে যাদেরকে "আলেম" বলা হয় তাঁদেরকে বুঝানো হয় নি, বরং কোরআন মজীদে যাদের সম্পর্কে يتفقهوا فى الدين বলা হয়েছে কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই তথা মুজতাহিদগণের ক্ষেত্রেই উল্লিখিত হাদীছের এ শব্দটি প্রযোজ্য। তেমনি এ ধরনের ব্যক্তির জন্য চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ('আদল্ বা তাক্ব্ওয়া)- এর অধিকারী হওয়া তথা চরম পন্থা ও শিথিল পন্থা থেকে মুক্ত

হওয়া এবং দূরদৃষ্টির (بصيرة) অধিকারী হওয়াও অপরিহার্য। আর বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়ও এটাকেই সমর্থন করে।

এ বিষয়টি ইসলামে কোনো নতুন বিষয় নয়, যদিও বহু শতাব্দী যাবত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় নি। অতঃপর খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) এ বিষয়টিকে "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" (ولاية فقيه- মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্ব) শিরোনামে একটি তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করেন। অতঃপর তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ইরানের মুসলিম জনগণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর পর সেখানে এ তত্ত্ব ভিত্তিক ইসলামী রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

দুর্ভগ্যজনক যে, সুন্নী জগতের কতক ইসলামী নেতা ও 'আলেম "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" তত্ত্বকে শিয়া মাযহাবের একান্ত নিজস্ব বিষয় বলে অভিহিত করে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, তত্ত্বটির নামের প্রতি দৃষ্টি না দিলেও এর মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের অনেক আগে থেকেই (এমনকি হযরত ইমাম খোমেইনী কর্তৃক তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপনেরও বহু আগে- হাজার বছরেরও বেশীকাল পূর্ব থেকেই) সুন্নী মাযহাবের অনুসারীরা এ তত্ত্বের মূল বক্তব্যের মুখাপেক্ষী ছিলো।

বস্তুতঃ শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা সমাজে মা'ছূম্ ইমামগণের ('আঃ) প্রকাশ্য উপস্থিতি কালে ইজতিহাদ ও "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" তত্ত্ব- কোনোটিরই মুখাপেক্ষী ছিলো না। কারণ, মা'ছূম্ (নবীই হোন বা ইমামই হোন) যখন সমাজে উপস্থিত থাকেন তখন দ্বীনী জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত জবাব দানের অধিকার এবং শাসন- কর্তৃত্বের অধিকার একমাত্র তাঁরই; কেবল মা'ছূমের অনুপস্থিতিতেই ইজতিহাদ ও "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" র প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সুন্নী 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের সাথে সাথে 'আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত' দ্বীন- ব্যাখাকারী এবং নেতা ও শাসনকর্তার পদের সমাপ্তি ঘটেছে সেহেতু يتفقهوا فى الدين সম্বলিত আয়াত ও العلماء ورثة الانبياء হাদীছ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর

ওফাতের পর মুহূর্ত থেকেই তাদের জন্য ওলামা তথা মুজতাহিদগণের দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

এ ক্ষেত্রে দ্বীনের ব্যাখ্যা ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ছাহাবী, তাবেঈন্ বা তাবে তাবেঈন্- এর কথা চিন্তা করা হলে তা একটি তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তাঁরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রজন্ম মাত্র। অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ততার প্রশ্নটি কোনো সাময়িক প্রশ্ন নয়, বরং তাঁর ওফাতের পর মুহূর্ত থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি স্থায়ী প্রশ্ন। তাই আল্লাহর মনোনীত স্থলাভিষিক্ততা তথা ইমামতের 'আক্বীদাহ্ গ্রহণ না করলে তত্ত্ব হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিক্তিতার বিষয়টি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রশ্নের উর্ধে চিন্তা করতে হবে এবং "ভেলায়াতে ফক্বীহ্" তত্ত্বটি এ ধরনেরই একটি তত্ত্ব। আর এ তত্ত্ব ছাহাবী, তাবেঈন্ বা তাবে তাবেঈন্ সহ যে কোনো প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য।

বস্তুতঃ বাস্তবে মুসলমানদের একজন দ্বীনী নেতা ও শাসক বা খলীফাহ্ "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" র জন্য অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন কিনা তা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন- যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু একজন দ্বীনী নেতা ও শাসকের জন্য যে এর সবগুলো গুণের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য সে ব্যাপারে বিতর্ক থাকতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, অতীতে সুন্নী জগতের মনীষীগণও যে এ বিষয়টির প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেন নি তা নয়। কারণ, তাঁদের অনেকে খলীফাহ্ বা শাসক মনোনয়নের এখতিয়ার اهل الحل والعقد (চূড়ান্ত মতামত প্রদানের এখতিয়ারের অধিকারীগণ)- এর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ পরিভাষাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হলেও এর অন্যতম সংজ্ঞা হচ্ছে "দ্বীনী বিষয়ে মতামত প্রদানের যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিগণ" - যা কেবল মুজতাহিদগণের বেলায়ই প্রযোজ্য হতে পারে।

মোদ্দা কথা, আজকের দিনে শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের একমাত্র সমাধান হচ্ছে "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" বা 'মুজতাহিদের শাসন- কর্তৃত্ব'।

হযরত ইমামে খোমেইনী (রহ্ঃ) কেবল যে এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা নয়, তিনি এর প্রায়োগিক পদ্ধতিও প্রদর্শন করে গেছেন। যেহেতু কোরআন মজীদের যে আয়াত ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যে হাদীছ এ তত্ত্বের ভিত্তি তাতে মাত্র একজন আলেম বা মুজতাহিদকে দ্বীনী নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি, বরং উভয় সূত্রেই বহুবচন বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু এ অধিকার ও দায়িত্ব সমাজে বিদ্যমান সকল মুজতাহিদের। তবে যেহেতু রা ক্ষমতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কেবল একজনের ওপরই ন্যস্ত করা যেতে পারে সেহেতু তাঁরা তাঁদের শাসনকর্তৃত্বের দায়িত্বটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনের ওপর অর্পণ করবেন।

কিন্তু এ অর্পণের মানে শাসনকর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার ও কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটা নয়। সুতরাং তাঁরা সব সময়ই শাসকের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন ও তাঁকে পরামর্শ দেবেন এবং শাসক যদি কখনো শারীরিক, মানসিক, নতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন তাহলে তাঁরা যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে অন্য কারো ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে দ্বীনী বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার ও কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুজতাহিদেরই থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীগণ নিজ নিজ অনুসৃত মুজতাহিদকেই অনুসরণ করতে থাকবে; রা ীয় দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রেই শাসক-মুজতাহিদের মতের অনুসরণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। শুধু তা-ই নয়, যে সব বিষয়ে রা র বাস্তবায়ন-কর্তৃত্ব বা বিচারিক কর্তৃত্ব থাকে এমন বিষয়াদিতেও যদি বিভিন্ন মাযহাব বা বিভিন্ন মুজতাহিদের রায়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকে (যেমন : বিবাহ-তালাক্ব ও মীরাছ ব নের ক্ষেত্রে কতক শাখাগত বিষয়) সে সব ক্ষেত্রেও সকলের ওপরে শাসক-মুজতাহিদের মত বা সংখ্যাগুরু মাযহাবের রায় চাপিয়ে দেয়া যাবে না। বরং বিবদমান পক্ষদ্বয় একই মাযহাবের বা একই মুজতাহিদের অনুসারী হলে তাদের ব্যাপারে তাদের অনুসৃত মাযহাব বা মুজতাহিদের রায় অনুযায়ী ফয়ছালাহ্ করতে হবে, তবে বিবদমান পক্ষদ্বয় যদি দুই

ভিন্ন মাযহাব বা মুজতাহিদের অনুসারী হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট জনপদে যারা সংখ্যাগুরু তাদের ফিক্বহী রায় অনুযায়ী ফয়ছালাহ্ করতে হবে।

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও এ নীতিই প্রযোজ্য হবে।

অবশ্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি, পররা নীতি, সশস্ত্র বাহিনী, যুদ্ধ, সন্ধি, আমদানী- রফতানী নীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদি একান্তভাবেই মুজতাহিদ শাসকের এখতিয়ারাধীনে থাকবে- যে সব ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে নির্বাচনকারী মুজতাহিদগণের এবং তাঁকে সহায়তাকারী আইন বিভাগ, প্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে কার্যকর করবেন। বস্তুতঃ এর চেয়ে উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী রা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) স্বয়ং শিয়া মাযহাবের অনুসারী একজন মুজতাহিদ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা শিয়া- সুন্নী যে কোনো দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য; এ তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য শিয়া মাযহাবের অনুসারী কোনো মুজতাহিদকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা জরুরী নয়। বরং সুন্নী মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত কোনো দেশে ইসলামী রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার শাসনকর্তৃত্ব সে দেশেরই কোনো মুজতাহিদের ওপর অর্পিত হবে।

[যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্নী সমাজে ইজতিহাদের দরযাহ্ বন্ধ গণ্য করার কারণে কোনো মুজতাহিদ নেই, কিন্তু এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে কোনো সমাজে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হলে ফরযে কেফায়ী হিসেবে অবশ্যই সেখানে ইজতিহাদ শুরু হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় হয়তো সেখানে ইসলামী রা ব্যবস্থা তথা "ভেলায়াতে ফাক্বীহ্" তত্ত্ব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অতএব, সুন্নী সমাজে কোনো শিয়া মুজতাহিদকে এনে শাসনকর্তৃত্ব দিতে হবে বা ইরান থেকে কোনো মুজতাহিদকে ধার করে এনে শাসনকর্তৃত্বে বসাতে হবে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, সুন্নী সমাজে ইজতিহাদের ধারা পুনঃপ্রবর্তিত হলে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যে শিয়া- সুন্নী বিভক্তি ও ব্যবধান রয়েছে তার পুরোপুরি বিলুপ্তি না ঘটলেও 'প্রায় বিলুপ্তি' ঘটবে।

কারণ, একজন প্রকৃত মুজতাহিদ মাযহাবী সঙ্কীর্ণতার উর্ধে থেকে সত্যকে উদঘাটন করেন এবং তিনি সত্য হিসেবে যে উপসংহারে উপনীত হন তা- ই সমাজের কাছে পেশ করেন।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, সুন্নী জগতে নতুন ইজতিহাদের দরযা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করার পরেও বিভিন্ন শতাব্দীতে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে কতক বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন, এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও কোনো কোনো ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এগুলো ছিলো নেহায়েতই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ; সুন্নী জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতিহাদের দরযা বন্ধই রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যারা এভাবে ইজতিহাদ করেছেন তাঁরাও 'আক্বাএদ , ফরয ও হারাম এবং ইজতিহাদী মূলনীতি সমূহের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়গুলোকে সাধারণতঃ স্পর্শ করেন নি, বরং পূর্বসুরিদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করে কিছু বিষয়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁদের ইজতিহাদকে ইজতিহাদে তাক্বলীদী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেহেতু অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জন্য এ বিষয়ে আলোকপাত করা যরূরী নয় সেহেতু আমরা এখানে তাঁদের নামোল্লেখ ও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদের কৃত ইজতিহাদের দুর্বলতা সমূহের উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।]

পরিশিষ্ট- ১

হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) আন্দোলনের তাৎপর্য

কারবালায় হযরত ইমাম হোসেনের (‘আঃ) শাহাদাত অনন্ত কাল ধরে সত্যসংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তবে তাঁর আন্দোলনের কারণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে যুগে যুগে যে সব মূল্যায়ন হয়েছে সে সবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বলা বাহুল্য যে, এ সব মূল্যায়নে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীসাথী ও পরিবারের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও সমবেদনা অভিন্ন উপাদান। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ আন্দোলনের স্বরূপ ও কারণ সম্পর্কিত মূল্যায়ন যতো বেশী নির্ভুল হবে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীসাথী ও পরিবারের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ থেকে আমরা ততো বেশী সঠিক শিক্ষা লাভ করতে ও উপকৃত হতে পারবো।

এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে হলেও প্রথমে ইসলামী ‘আক্বাএদে অর্থাৎ ইসলামের তাত্ত্বিক ভিত্তিতে হযরত ইমাম হোসেনের (‘আঃ) মর্যাদা সম্পর্কে আভাস দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

একজন মানুষের অনেকগুলো মর্যাদা থাকতে পারে এবং তাঁর সবগুলো মর্যাদা সম্বন্ধে সকলের মধ্যে মতৈক্য না- ও থাকতে পারে। তবে হযরত ইমাম হোসেনের (‘আঃ) যে মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহ্ অভিন্ন মত পোষণ করে তা হচ্ছে, তিনি এবং তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (আঃ) রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের সদস্য; অপর দু’জন তাঁদের পিতা- মাতা হযরত আলী (‘আঃ) ও হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি ‘আলাইহা); এ চারজনের ব্যাপারে এমন কোনো ভিন্নমত নেই যা এ ব্যাপারে বি মাত্রও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। আর আহলে বাইতের (‘আঃ) সদস্যগণ শুধু গুনাহ্ থেকেই মুক্ত নন বরং সকল প্রকার চারিত্রিক ও আচরণগত অপকৃষ্টতা থেকেও মুক্ত (সূরাহ্ আল্- আহ্যাব : ৩৩)।

পাপমুক্ততার এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মর্যাদা নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) মর্যাদার সমস্তরের। যদিও রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না এবং

কারো প্রতি নতুন কোনো আয়াত বা শরঈ বিধান নাযিল হবে না, তবে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর উম্মাতের ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা বানী ইসরাঈলের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) সমান এবং তাঁরা নবী- রাসূলগণের ('আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি; এ তিনটি মর্যাদা আহলে বাইতের সদস্যদের ক্ষেত্রে শতকরা একশ ' ভাগ প্রযোজ্য। তাই তাঁদের প্রতি দরূদ বর্ষণ ছাড়া আমাদের নামায ও খুত্ববাহ্ ছহীহ্ হয় না। এ কারণে নামাযের দরূদে বলতে হয় : "হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের (অর্থাৎ আহলে বাইতের) প্রতি দরূদ প্রেরণ করো যেভাবে তুমি ইবরাহীম্ ও আলে ইবরাহীমের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছো ...। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের (অর্থাৎ আহলে বাইতের) প্রতি বরকত নাযিল করো যেভাবে তুমি ইবরাহীম্ ও আলে ইবরাহীমের প্রতি বরকত নাযিল করেছো ...।" আর হাদীছের (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকেম, কানযুল্ 'উম্মাল্, . . .) ভিত্তিতে খুত্ববায় আমরা হযরত ইমাম হোসেন ও হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)কে 'বেহেশতে যুবকদের নেতা ' বলে উল্লেখ করি।

শুধু তা- ই নয়, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেনের ('আঃ) সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টিকে তাঁর সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি বলে (ইবনে মাজাহ্) এবং তাঁর সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি ও বেহেশত- দোযখের পরিণতি বলে (মুস্তাদরাকে হাকেম্, হাইছামী, ত্বিবরানী ও কানযুল্ 'উম্মাল্) উল্লেখ করেছেন। এছাড়া যারা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করেন (তিরমিযী)।

আল্লাহর রাসূল হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির জন্য ইমাম বা নেতা মনোনীত করেন এবং তাঁর প্রশ্নের জবাবে জানান যে, তাঁর বংশের নেককারদেরও [অর্থাৎ আলে ইবরাহীমকে তথা তাঁর বংশের নবী- রাসূলগণ ও বিশেষ নেককার লোকদেরকে ('আঃ)] ইমাম বা নেতা বানানো হলো (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১২৪)। অতএব, নামাযের বিশেষ দরূদে আলে ইবরাহীমের সাথে আলে মুহাম্মাদের তুলনা

থেকে উম্মাতের ওপর আলে মুহাম্মাদের দ্বীনী নেতৃত্ব এবং সেই সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হক্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

সংক্ষেপে এই হলো আমাদের 'আক্বাএদে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর বিতর্কাতীত মর্যাদা। আর বিচারবুদ্ধির আলোকে ও সাধারণ দৃষ্টিতেও একটি ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব অর্পিত হতে হবে দ্বীনী জ্ঞান, আচরণ ও যোগ্যতার বিচারে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির ওপরে।

অন্যদিকে বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের ভার সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কারো ওপর অর্পণ করা না হলে বা এরূপ ব্যক্তি সমাজে উপস্থিত না থাকলে এ দায়িত্ব অর্পণের জন্য জনগণের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী কাউকে বেছে নিতে হবে; রাজতন্ত্র, স্বরতন্ত্র, ক্ষমতা জবর দখল, জোর করে জনগণের ওপর শাসন- কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া, ধোঁকা- প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, উৎকোচ প্রদান বা অন্য যে কোনো অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে রা ক্ষমতা করায়ত্তকরণ তথা ধর্মসম্পর্কহীন (সেক্যুলার) নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে বধ নয়। এ সব বিষয়কে বিবেচনায় রাখলে এটা সন্দেহাতীত যে, ইসলামী উম্মাহর ওপর ইয়াযীদের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব ছিলো পুরোপুরি অবৈধ।

অবশ্য সত্যিকারের দ্বীনী নেতৃত্ব অবৈধ নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের মোকাবিলায় কখন কোন্ কর্মনীতি অনুসরণ করবেন তা নির্ভর করে স্থান- কাল ও পরিস্থিতির ওপর এবং এ সবের মূল্যায়ন করে তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করবেন। স্বয়ং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর ম ায় প্রথম তিন বছর গোপনে দ্বীনী দাও ' আতের কাজ করেন, অতঃপর দশ বছর স্থানীয় কুফরী নেতৃত্বের যুলুম- অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রতিরোধে না গিয়ে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাও ' আত দেন এবং এরপর মদীনায় গিয়ে ইসলামী হুকূমাত্ প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁর মদীনাহর জীবনের দশ বছরে তাঁকে পরিস্থিতিভেদে যুদ্ধ, সন্ধি, কূটনৈতিক যোগাযোগ ও দাও ' আত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের

কর্মনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের ('আঃ) অনুসৃত কর্মনীতিও ছিলো অভিন্ন।

এ বিষয়টির প্রতি এ কারণে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন যে, আমাদের মধ্যে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) ও হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)কে দুই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; একজনকে অসম সাহসী বীর পুরুষ ও একজনকে খুবই নরম মনের মানুষ গণ্য করা হয়, অথচ আমাদের 'আক্বাএদে (নামাযের দরূদ ও খুত্ববাহর ভিত্তিতে) উভয়ের মর্যাদা অভিন্ন। বিষয়টির প্রতি অগভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করার কারণেই আমরা এরূপ মনে করে থাকি, অথচ হযরত ইমাম হাসান ('আঃ) তাঁর জীবনে অনেকগুলো যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অন্যদিকে মু'আভীয়াহর বিশ বছর ব্যাপী রাজত্বকালের দশ বছর পর হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)কে বিষপ্রয়োগে শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদাতের পর আহলে বাইতের এবং তাঁদের ভক্ত- অনুরক্ত- অনুসারীদের নেতৃত্বে আসেন হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)। কিন্তু তিনি মু'আভীয়াহর শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রচারে অবতীর্ণ হন নি- যা তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে করেছিলেন। এর কারণ তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যকার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নয়, বরং পরিস্থিতির পার্থক্য।

ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরক্বাহ্ হযরত আলীর ('আঃ) খেলাফতের বধতার ব্যাপারে একমত এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সাধারণ জনগণের অনুরোধে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; স্বল্পসংখ্যক লোক তাঁকে খলীফাহ্ বানান নি। এতদসত্ত্বেও মু'আভীয়াহ্ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

হযরত আলীর ('আঃ) শাহাদাতের পর শহীদ বধ খলীফাহর অনুসারী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)কে খলীফাহ্ হিসেবে বরণ করে নেন। কিন্তু মু'আভীয়াহ্ যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা দখল করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঐ সময় হযরত ইমাম হাসান ('আঃ)- এর অধীনে চল্লিশ হাজার সন্য ছিলো। এমতাবস্থায় তিনি যুদ্ধ করলে সে যুদ্ধে হার- জিত যার যা- ই হতো না কেন, বিপুল সংখ্যক হতাহতের কারণে মুসলমানদের সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতো এবং এই সুযোগে রোম সাম্রাজ্য হামলা চালিয়ে খুব সহজেই গোটা ইসলামী ভূখণ্ডকে দখল করে

নিতো। এ কারণে, ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণ তথা অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে হযরত ইমাম হাসান ('আঃ) তাঁর বধ খেলাফতকে মু'আভীয়াহর হাতে ছেড়ে দেন।

অবশ্য মু'আভীয়াহ্ লিখিতভাবে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর পরে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) খলীফাহ্ হবেন। কিন্তু তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করেন নি এবং স্বীয় চরিত্রহীন অযোগ্য পুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফাহ্ তথা যুবরাজ হিসেবে মনোনীত করে যান।

এতো কিছু সত্ত্বেও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) মু'আভীয়াহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রচারে অবতীর্ণ হন নি। কারণ, সর্বসম্মত বধ খলীফাহ্ হযরত আলীর ('আঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ইয়াযীদকে যুবরাজ মনোনীত করার মধ্য দিয়ে অনৈসলামী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন সহ মু'আভীয়াহর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচার- বিশ্লেষণ করা ও তা বোঝা তৎকালীন পরিবেশে সাধারণ মুসলিম জনগণের পক্ষে সম্ভব ছিলো না এবং তাদেরকে তা বুঝানোও সম্ভব ছিলো না। কারণ, সাধারণ মানুষ জানতো যে, মু'আভীয়াহ্ ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ছাহাবী ও ওয়াহী- লেখকদের অন্যতম। কারণ, মু'আভীয়াহর সমর্থকদের পক্ষ থেকে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হতো। অন্যদিকে দৃশ্যতঃ জনগণের চোখে পড়ার মতো বাহ্যিক দ্বীনী আমলের ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোনো শথিল্য ছিলো না। এছাড়া (এবং অংশতঃ এ কারণেও) অনেক ছাহাবীও তাঁর সাথে ছিলেন। তাই হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) মু'আভীয়াহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতায় ও প্রচারে অবতীর্ণ হলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো এবং মু'আভীয়াহর পক্ষে তাঁর বিরাট প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্র কাজে লাগিয়ে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে ক্ষমতালোভী হিসেবে জনগণকে বিশ্বাস করানো সম্ভব হতো। এটাই ছিলো ঐ সময় তাঁর নীরবতার কারণ।

কিন্তু ইয়াযীদ ক্ষমতায় বসার পর পরিস্থিতি পা যায়। কারণ, ইয়াযীদের অনৈসলামী চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিলো এমনই সুস্পষ্ট যে, জনগণ কখনোই তাকে দ্বীনদার মনে করতো না, ফলে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর পক্ষ থেকে তার বিরোধিতায় বিভ্রান্তির কোনো কারণ ছিলো না।

শুধু তা- ই নয়,   এ ক্ষেত্রে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর নীরবতাও হতো ইসলামের জন্য বিপর্যয়কর। কারণ,   নবী- রাসূলগণের ('আঃ) সমতুল্য মর্যাদা নিয়েও তিনি যদি কেবল প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে নীরব থাকতেন তাহলে এটা সকল মুসলমানের জন্য সুবিধাবাদ ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত হতো। তাই তিনি স্বল্পসংখ্যক অনুসারী নিয়েও প্রকাশ্যে সত্যের পতাকা উত্তোলন করেন।

এখানে এ কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে,   হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। তিনি কেবল ইয়াযীদের মতো চরিত্রহীন ব্যক্তিকে খলীফাহ্ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং জনগণের কাছে সত্যকে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে,   তাঁর আন্দোলন ক্ষমতা দখলের জন্য নয়,   বরং তাঁর নানার [রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর] আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করা এবং 'ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজে নিষেধ করা ' র লক্ষ্যে।

লক্ষণীয়,   হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) ইয়াযীদের অনুকূলে বাইআত হন নি,   অতএব,   ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তাঁর উত্থানকে বিদ্রোহ বলা চলে না। তিনি যা করেন তা ছিলো জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা। অন্য কথায়,   তিনি স্বীয় মত প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

আজকের দিনে বিশ্বের অধিকাংশ অমুসলিম দেশেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সরকারের বিরোধিতা,   এমনকি জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বৈধ গণ্য করা হয়। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন হবার দাবীদার ইয়াযীদের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনে সে অধিকারটুকুও স্বীকার করা হচ্ছিলো না।

এখানে উল্লেখ্য যে,   বর্তমান যুগের পার্থিব [সেক্যুলার] রাজনৈতিক বিবেচনায় মু'আভীয়াহ্ অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন,   এ কারণে তিনি বুঝতে পারেন যে,   হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর কাছ থেকে জোর করে বাইআত আদায় করতে গেলে তার পরিণতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই তিনি ইয়াযীদকে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর কাছ থেকে

বাইআত আদায়ের চেষ্টা করতে নিষেধ করে যান এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে যান।

কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী ইয়াযীদ তাঁর পিতার উপদেশ উপেক্ষা করে হযরত ইমাম হোসেন (‘আঃ)-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে বাইআত আদায়ের জন্য মদীনাহর উমাইয়াহ্ প্রশাসকের প্রতি নির্দেশ দেয়। এমতাবস্থায় হযরত ইমামের (‘আঃ) অনুসারীরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকলেও যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য রা ক্ষমতা ‘দখল করা ’ ছিলো না, সেহেতু তিনি রক্তপাত এড়ানোর জন্য রাতের অন্ধকারে মদীনাহ্ ত্যাগ করে ম াহর পথে রওয়ানা হন এবং ম ায় এসে আল্লাহর ঘরের পাশে আশ্রয় নিয়ে তাঁর সত্যপ্রকাশের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। এ অবস্থায় ইয়াযীদ হ র সমাবেশে ভীড়ের মধ্যে তাঁকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠায়। হযরত ইমাম হোসেন (‘আঃ) তা জানতে পারেন। কিন্তু তিনি মসজিদুল হারামে বা পবিত্র ‘আরাফাহর ময়দানে তাঁর রক্তপাত হোক তা চান নি। অন্যদিকে কূফাহবাসীরা সেখানে গিয়ে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁকে শত শত পত্র লিখে ও সেগুলো সহ তাঁর কাছে বহু প্রতিনিধি পাঠায়। এমতাবস্থায় তিনি হ র আগের দিন (হিজরী ৬০ সালের ৮ই যীল্- হা) ম াহ্ ত্যাগ করে কূফাহর পথে রওয়ানা হন।

হযরত ইমাম হোসেন (‘আঃ) কূফাহর জনগণের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতেন যে, তাদের অঙ্গীকারের ওপর আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু যেহেতু কেউ কার্যতঃ অপরাধ না করা পর্যন্ত তাকে অপরাধী গণ্য করা চলে না সেহেতু তিনি তাদের ডাকে সাড়া না দিলে এটা ইসলামী আচরণবিধি অনুযায়ী খারাপ দৃষ্টান্ত হতো এবং যে কারো জন্য যে কারো সাথে কেবল সন্দেহবশে আচরণ করার বধতা সৃষ্টি হয়ে যেতো।

অবশ্য কারবালায় উপনীত হবার পর তাঁর কাছে কূফাহ- বাসীদের (অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে) বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়। অতঃপর আর তাঁর জন্য কূফায় যাওয়ার নতিক বাধ্যবাধকতা থাকে নি। এমতাবস্থায় তিনি অন্যত্র চলে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্বীয়

তাবেদারদের প্রতি ইয়াযীদের নির্দেশ ছিলো এই যে, হযরত ইমামের ('আঃ) কাছ থেকে বাইআত আদায় করতে হবে, আর তিনি তাতে সম্মত না হলে তাঁকে হত্যা করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে, হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর পক্ষে ইয়াযীদের অনুকূলে বাইআত করা সম্ভব ছিলো না। এমতাবস্থায় তিনি নীরবে যালেমের তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দেবেন এটাও ছিলো অচিন্ত্যনীয়। অতএব, এর মানে ছিলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। কিন্তু তিনি যুদ্ধ ও রক্তপাতে আগ্রহী ছিলেন না এবং এ জন্য তিনি আসেনও নি। তাই তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে (মদীনায়) ফিরে যাবার বা দেশের সীমান্তের বাইরে হিজরত করার বিকল্প প্রস্তাব দেন।

কিন্তু ইয়াযীদের বাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে, বরং ইয়াযীদের পক্ষ থেকে যে দু'টি বিকল্প দেয়া হয়েছিলো তার ভিত্তিতে তার অনুগত বাহিনী হযরত ইমামের ('আঃ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে হযরত ইমামকে অস্ত্র হাতে নিতে হয় এবং ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যে প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এ অসম যুদ্ধে বাহাত্তর জন সঙ্গীসাথী সহ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

কেবল স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সত্য প্রচারের কারণে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের যেভাবে হত্যা করা হয় তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর চেতনাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, তা তাদের মধ্যে ঈমানদীপ্ত নতুন প্রাণের সঞ্চার করে এবং ইসলামের ইতিহাসে সত্যের জন্য আত্মত্যাগের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে, শুধু তা- ই নয়, তিনি সমগ্র মানবতার জন্য সংগ্রামী প্রেরণার দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি দ্বীনের যে খেদমত আঞ্জাম দিলেন তিনি বেঁচে থাকলে এবং অনুসারীগণ সহ সর্বস্ব বিনিয়োগ করে প্রচারকার্য চালিয়েও তা পারতেন না।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) যুদ্ধবায ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বীয় নীতি- আদর্শ ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের প্রশ্নে আপোসহীন। তিনি ছিলেন স্বরতন্ত্র ও সুবিধাবাদ উভয়কে প্রত্যাখ্যানের প্রতীক- অটল পাহাড়ের ন্যায়।

যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদেরকে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- উভয় কর্তৃক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুসৃত বিভিন্ন কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে। কেবল তাহলেই তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসার সার্থকতা।

পরিশিষ্ট- ২

কারবালার চেতনা কি বিলুপ্তির পথে?

প্রতি বছরের মতো এ বছর (হিজরী ১৪৩৪)- ও আশূরার আগমন ঘটে এবং সরকারী ছুটি, রা ীয় ও দলীয় নেতাদের বাণী, সংবাদপত্রে বিশেষ রচনা বা পাতা প্রকাশ, ইলেক নিক মিডিয়ায় বিশেষ আলোচনা, বিভিন্ন সংগঠনের সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের শোকানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ দিনটি পালিত হয়। গতানুগতিকভাবে সংবাদ- শিরোনামে 'যথাযথ মর্যাদায় পবিত্র আশূরা পালিত ' বলার জন্য অনেকের কাছেই এটা যথেষ্ট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলেই কি বর্তমানে আমাদের দেশে ও সমাজে যেভাবে আশূরা পালিত হচ্ছে সে জন্য 'যথাযথ মর্যাদায় ' কথাটি প্রযোজ্য?

এটা অনস্বীকার্য যে, আশূরা দিবসের মূল উপলক্ষ্য হচ্ছে কারবালায় সঙ্গীসাথী সহ হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর মর্মান্তিক শাহাদাত। কিন্তু আমাদের সমাজে আশূরা পালনে ধীরে ধীরে কারবালার ঘটনার গুরুত্ব ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে াস পেয়েছে এবং এখনো াস পাচ্ছে। এখন থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বেও অত্র ভূখণ্ডে, শুধু আশূরার দিনে নয়, সারা বছরই কারবালার ঘটনার যে গুরুত্ব ছিলো তা ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছে।

এতদ্দেশে অতীতে কারবালার ঘটনার যে গুরুত্ব ও প্রভাব ছিলো তা নিয়ে আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অবকাশের প্রয়োজন; এখানে কেবল এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, তখন শুধু আশূরার দিনে নয়, গোটা মহররম মাসে বিয়েশাদী হতো না (কিন্তু এখন হচ্ছে) এবং কারবালার ঘটনাবলী সম্পর্কিত পুঁথি পাঠের আসর, 'বিষাদ সিন্ধু ' পাঠের আসর, জারী গানের আসর ও যাত্রাভিনয় ('ইমাম যাত্রা ' ও 'যয়নাল উদ্ধার ') বর্ষা মওসূম ছাড়া বছরের যে কোনো সময় ও শহর- গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতো- যাতে উপস্থিতি হতো ব্যাপক। কিন্তু পাশ্চাত্য সহ বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভ্রান্ত চিন্তাধারার ব্যাপক বিস্তারের

ফলে বাংলাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্য থেকে উপরোক্ত অনুষ্ঠানাদি ও সে সব যে চেতনার বাহক ছিলো তার প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে।

কারবালার চেতনার প্রায় বিলুপ্তির জন্য ওপরে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সে সবের স্বয়ংক্রিয় প্রভাবই এ চেতনাকে প্রায় বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয় নি, বরং এ জন্য পরিকল্পিত অপচেষ্টাও চালানো হয়েছে- যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ অপচেষ্টারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এ মর্মে প্রচার চালানো যে, আশূরার দিন কেবল কারবালার ঘটনার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এ দিনে আরো বহু ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

যদিও এটা অনস্বীকার্য যে, মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ফিরিস্তি তরী করা হলে দেখা যেতো যে, বছরের তিনশ ' পয়ষি দিনের প্রতিটি দিনেই সুখ-দুঃখের বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই সাথে আরো দু'টি সত্য অনস্বীকার্য, তা হচ্ছে, প্রথমতঃ অকাট্যভাবে প্রমাণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে কারবালার ঘটনার তুলনায় অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই গুরুত্বহীন বলে প্রতিভাত হয়, দ্বিতীয়তঃ এ দিনে ধর্মীয় দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আরো যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হয় সে সব ঘটনা যে এ দিনেই সংঘটিত হয়েছিলো তা কোনো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অকাট্য ঐতিহাসিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত ঘটনাবলীর বাইরে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে কেবল দু'টি সূত্র থেকে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে কোরআন মজীদ ও মুতাওয়াতি হাদীছ (ছাহাবীগণ সহ বর্ণনার প্রতিটি স্তরে এমন বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত যা মিথ্যা হওয়া মানবিক বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব)। এর বাইরে স্বলপসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত, বিশেষ করে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে শুনেছেন বলে স্বল্পসংখ্যক ছাহাবীর নামে বর্ণিত হাদীছ- যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খবরে ওয়াহেদ ' বলা হয়- থেকে অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না।

আমাদের এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, স্বল্পসংখ্যক ছাহাবীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরবর্তী কোনো স্তরে এসে ছাহাবীদের নামে তা রচিত হয়ে থাকতে পারে। কারণ, ইসলামের ইতিহাসে যে হাজার হাজার মিথ্যা হাদীছ রচিত হয়েছিলো এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের অন্ততঃ দু'শ বছর পরে সংকলিত হাদীছ- গ্রন্থ সমূহে স্থানপ্রাপ্ত খবরে ওয়াহে হাদীছ সমূহকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, হাদীছ- সংকলকগণ আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত নবী- রাসূল বা ইমাম ('আঃ) ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের কাজের ওপর অন্ধভাবে আস্থা পোষণ করা চলে না। অধিকন্তু তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিচার- বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পরবর্তী কমপক্ষে দীর্ঘ দুই শতাব্দী কালের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বর্ণনাকারী সম্বন্ধে ও তাঁদের প্রতিটি বর্ণনা সম্বন্ধে শতকরা একশ ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

অবশ্য এতদসত্ত্বেও চারটি অকাট্য মানদণ্ড অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি (আক্বল্), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতি হাদীছ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মতৈক্য (ইজমা'এ উম্মাহ্)- এর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে ফিক্বাহর ক্ষেত্রে গৌণ ও প্রায়োগিক বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহে হাদীছ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে খবরে ওয়াহে বর্ণনা গ্রহণের কোনোই উপযোগিতা নেই।

কোরআন মজীদে অতীতের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা সে সবের সুনির্দিষ্ট দিন- তারিখ উল্লেখ করেন নি।

বস্তুতঃ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এ সবের সুনির্দিষ্ট দিন- তারিখ জানা একদিকে যেমন অপরিহার্য ছিলো না, অন্যদিকে জানাতে গেলে তাতে জটিলতার সৃষ্টি হতো। কারণ, চা ্য মাসগুলো বর্তমানে যেভাবে গণনা করা হয় জাহেলিয়্যাতের যুগে মাসগুলোর নাম প্রায় অভিন্ন থাকলেও তার গণনা পদ্ধতি অভিন্ন ছিলো না; চা ্য বর্ষ সৌর বর্ষের তুলনায় ক্রমেই পিছিয়ে যায় বলে তৎকালে চা ্যবর্ষ গণনাকে সৌর বর্ষ গণনার সাথে সম য় সাধনের লক্ষ্যে পর পর কয়েক বছর বারো চা ্য মাসে বছর গণনার পর একটি বছর তেরো মাসে গণনা করা হতো।

এমতাবস্থায় ইসলামী চা ় বর্ষের দিন- তারিখের সাথে খাপ খাইয়ে অতীতের ঘটনাবলীর দিন- তারিখ উল্লেখ করা হলে জটিল প্রশ্নের অবতারণা হতো। এ ধরনের অনপরিহার্য বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যাওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় যার প্রমাণ, কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা আছহাবে কাহফ্- এর সদস্যসংখ্যার ব্যাপারে কোরআন নাযিল কালে প্রচলিত বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁদের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করেন নি। কারণ, তা করলে সে ক্ষেত্রে ইসলামের দুশমনরা তার যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করতো। কিন্তু আছহাবে কাহফ্- এর সঠিক সদস্যসংখ্যা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যা জানানোর জন্য অযথা জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনাকে মেনে নেয়া যেতো।

কারবালার ঘটনার পূর্বে যে সব ঘটনা আশূরার দিনে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় সে সব ঘটনাও এ পর্যায়ের। অর্থাৎ সেগুলোর সঠিক দিন- তারিখ জানা লোকদের জন্য কোনো যরূরী বিষয় নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে ঐ সব ঘটনার দিন- তারিখ জানান নি। এর মানে হচ্ছে ঐ সব ঘটনা ঐ দিনেও হয়ে থাকতে পারে, অন্য বিভিন্ন তারিখেও সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি আশূরার দিনে ঘটেছিলো বলে দাবী করা হয় তা যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দিনে আসমান- যমীন সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, চা ় মাস গণনার ভিত্তি যেখানে পৃথিবীর চারদিকে চ ের আবর্তন এবং স্বীয় অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন থেকে উদ্ভূত চ কলা সেখানে পৃথিবী সৃষ্টির আগে চা ় মাস গণনা ও তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সৃষ্টি দশই মহররম বলে নির্ধারণের ভিত্তি কী?

যা- ই হোক, এতদসত্ত্বেও অতীত ইতিহাসের অন্য যে সব ঘটনাকে আশূরার দিনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সেগুলো যদি ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে অবশ্যই তা অকাট্য সূত্রে (কোরআন মজীদ ও মুতাওয়াতি হাদীছ) বর্ণিত হতো। তা যখন হয় নি তখন খবরে ওয়াহে হাদীছের ভিত্তিতে এ সব ঘটনা ঐ দিনেই সংঘটিত হয়েছিলো বলে ধরে নেয়ার ও তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করার যৌক্তিকতা নেই, বিশেষ করে মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের স্বর্ণযুগ

উমাইয়াহ্ শাসনামলে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার গুরুত্বকে হা া করার লক্ষ্যে এ সব হাদীছ রচিত হয়ে থাকার সম্ভাবনাকে যখন উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এর পরেও যারা মনে করেন যে, ঐ সব ঘটনা আশূরার দিনেই সংঘটিত হয়েছিলো তাঁরা তা ধরে নিন, কিন্তু এ ধরে নেয়ার ভিত্তিতে যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কারবালার চেতনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, তো সে সম্পর্কে মন্তব্য করার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

সজ্ঞানে বা অজ্ঞতাবশতঃ 'কারবালার চেতনাকে হত্যার চেষ্টা ' যে করা হচ্ছে তার এক গুরুতর দৃষ্টান্ত, হিজরী ১৪৩৪ সালের আশূরা উপলক্ষ্যে একটি দনিক পত্রিকায় (২৫শে নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায়) প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম দেয়া হয় :'আজ পবিত্র আশূরা : শুধু শোকের নয় বরকতময় আনন্দেরও ' (??! !) ।

উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে বলা হয় :

" প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী সৃষ্টির পর হজরত আদম (আ.)- কে ও মা হাওয়া (আ.)- কে সহ পৃথিবীতে পাঠানোর মতো আরও অনেক কল্যাণকর ও দিকনির্ধারণী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মহররমকে বরং অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ এবং বরকতময় দিন হিসেবে উদযাপন করা উচিত। মুসলমানদের উচিত আনন্দ- উৎসব করা এবং আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো। " (???! ! !)

[উদ্ধৃতিতে পত্রিকাটির ব্যবহৃত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।]

কোরআন মজীদে যে আহলে বাইতের ('আঃ) পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে অকাট্য ও সর্বসম্মত মত ('ইজমা'এ উম্মাহ্) অনুযায়ী সে আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- যাকে 'বেহেশতে যুবকদের নেতা ' বলে উল্লেখ ব্যতীত জুমু ' আহ্ ও ঈদের খোত্ববাহ্ ছহীহ্ হয় না (আর খোত্ববাহ্ ছহীহ্ না হলে সংশ্লিষ্ট নামাযও ছহীহ্ হয় না) এবং সে আহলে বাইতের (আলে মুহাম্মাদের) প্রতি দরূদ বর্ষণ ব্যতীত নামায ছহীহ্ হয় না। অতএব, হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) শিয়া- সুন্নী বিতর্কের উর্ধে গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রিয় এবং তাঁর শাহাদাতের দিন বিশ্বের পৌনে দু'শ কোটি মুসলমানের জন্য মর্মবিদারী শোকের দিন। তাই অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত এ দিনের সাথে সম্পৃক্তকৃত আনন্দের ও বরকতের ঘটনাবলী তো দূরের

কথা, অকাট্যভাবে প্রমাণিত আনন্দের ঘটনাবলীও এ দিনটিকে আনন্দের দিনে পরিণত করতে পারে না। কারণ, উদাহরণস্বরূপ, ২১শে ফে য়ারী অবিতর্কিতভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের শোকাবহ দিন। নিঃসন্দেহে ইতিহাসে অনুসন্ধান করলে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো দৃষ্টিতে এ দিনে বহু আনন্দের ঘটনা পাওয়া যাবে। কেউ যদি এগুলো খুঁজে বের করে এবং এমনকি সে সব তথ্য যদি অকাট্য ডকুমেন্ট ভিত্তিকও হয়, তো সে ক্ষেত্রে আমরা কি এ দিনটিকে আনন্দের দিন হিসেবে উদযাপন করতে প্রস্তুত হবো? নিঃসন্দেহে হবো না। তাহলে কী করে হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর শাহাদাত দিবসকে আনন্দ- উৎসবের দিবস হিসেবে উদযাপন করার চিন্তা কোনো মুসলমানের মাথায় আসতে পারে?

উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা যদি সজ্ঞানে করা হয়ে থাকে তো বলবো যে, এর দ্বারা বিশ্বের পৌনে দু'শ কোটি মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হেনে তাদের হৃদয়ে নিরাময়ের অতীত ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যদি অজ্ঞতাবশতঃ করা হয়ে থাকে তাহলে বলবো, ইসলাম সম্পর্কে লেখার জন্য যাদের ন্যূনতম অপরিহার্য জ্ঞান নেই তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে না লিখলেই বরং ইসলামের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হবে।

রচনা : ২৫- ১১- ২০১২

সর্বশেষ পরিমার্জন : ১০- ১০- ২০১৫

পরিশিষ্ট- ৩

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগের মুনাফিক্ব্

বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ছ্বাহাবী ছিলেন তাঁরা যারা তাঁকে খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও ঈমানের ঘোষণার পরে তাঁকে চাক্ষুষভাবে দেখেছেন এবং মৃত্যুর আগে এ ঘোষণা পরিত্যাগ করেন নি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর উক্তি হিসেবে দাবী করে একটি খব্ রে ওয়াহে হাদীছে বলা হয়েছে যে, তিনি এরশাদ করেছেন :

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. - "আমার ছ্বাহাবীরা হচ্ছে নক্ষত্রতুল্য; তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা হেদায়াত পাবে।" আরেকটি খব্ রে ওয়াহে হাদীছে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) দশজন ছ্বাহাবীকে নামোল্লেখ করে তাঁদের জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ দু'টি খব্ রে ওয়াহে হাদীছের ভিত্তিতে, প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীগণকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করা হয়; এমনকি তাঁদের কারো সমালোচনা করলে সমালোচনাকারীকে কাফের বলেও ঘোষণা করা হয়, যদিও উক্ত সংজ্ঞা ও কুফরীর ফত্ওয়া ইসলামের কোনো অকাট্য জ্ঞানসূত্র (আক্বল, কোরআন, মুতাওয়াতি হাদীছ ও প্রথম যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর মতৈক্য ভিত্তিক বিষয়াদি) থেকে গৃহীত হয় নি।

অন্যদিকে মুনাফিক্বের সংজ্ঞা কোরআন মজীদের একাধিক আয়াত্ থেকে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। মুনাফিক্ব্ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মুখে ঈমানের দাবী করলেও অন্তরে ঈমানদার নয়। সুতরাং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর যুগের মুনাফিক্ব্ ছিলো সেই সব লোক যারা মুখে ঈমানের ঘোষণা দিলেও এবং বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের ন্যায় আমল করলেও অন্তরে ঈমান পোষণ করতো না; এরা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ), ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অকল্যাণ কামনা করতো, গোপনে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ), ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করতো; নিঃসন্দেহে তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর

ওফাতের পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যকার মুনাফিক্বদের এ চরিত্র ও অপচেষ্টা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর ওফাত- পরবর্তী যুগ সমূহেও অব্যাহত থাকে।

এবার আমরা দেখবো যে, কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী সংক্রান্ত বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞাটি সঠিক কিনা এবং বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞাটি সঠিক হলে ছ্বাহাবীদের নক্ষত্রতুল্য বলে অভিহিতকারী হাদীছটি ও দশজন ছ্বাহাবীকে জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানকারী হাদীছটি- যে দু'টি হাদীছের ভিত্তিতে বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের কারো সমালোচনাকারীকে কাফের বলে ফত্ওয়া দেয়া হয়- ছ্বহীহ্ কিনা।

যারা উপরোক্ত প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের মর্যাদা ও জীবদ্দশায় দশজন ছ্বাহাবীর বেহেশতের সুসংবাদ লাভের ধারণায় বিশ্বাসী তাঁরা সাধারণতঃ তাঁদের মতের সপক্ষে কোরআন মজীদের দু'টি আয়াত্ উদ্ধৃত করে থাকেন; একটি হচ্ছে সূরাহ্ আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়াত্ এবং আরেকটি হচ্ছে সূরাহ্ আল্- ফাত্ হ্- এর ২৯ নং আয়াত্।

সূরাহ্ আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

"আর মুহাজিরদের মধ্যকার প্রথম অগ্রবর্তীগণ ও তাদেরকে সাহায্যকারীগণ (আন্ ছ্বা গণ) এবং যারা (এ ব্যাপারে) তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) ওপর সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে সেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে; বস্তুতঃ এ এক বিরাট সাফল্য।"

আর সূরাহ্ আল্- ফাত্ হ্- এর ২৯ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)

“আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ও যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল .... তাদের মধ্যকার যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”

এখানে আলোচনার শুরুতেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কোরআন মজীদে বিশেষভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে নামোল্লেখ করে কোনো মানুষকেই জীবদ্দশায় বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দেয়া হয় নি; সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঈমান ও আমলের শর্তে সাধারণভাবে। যদিও আমরা জানি যে, নবী- রাসূলগণ ('আঃ) সহ আল্লাহর খাছ্ব বান্দাহ্ গণ- যারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের ওপর ইন্তেকাল করেছেন- অবশ্যই বেহেশতে যাবেন, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁদের কাউকেই, এমনকি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে- যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জগতসমগ্রের জন্য তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত্ বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁকেও বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দেয়া হয় নি। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর উদ্দেশে এরশাদ করেন :

(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ)

“(হে রাসূল!) বলুন, আমি রাসূলদের মধ্যে কোনো অভিনব রাসূল নই এবং আমি জানি না আমার কাছে যা ওয়াহী করা হয়েছে তা ব্যতীত আমি যদি অন্য কিছুর অনুসরণ করি তাহলে আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আর আমি তো সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী ব নই।” (সূরাহ্ আল্- আহ্ ক্বাফ্ : ৯)

এমতাবস্থায় এটা কী করে সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা নামোল্লেখ করে দশজন ছ্বাহাবীকে বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দিয়ে থাকবেন? সুতরাং সংশ্লিষ্ট হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর নামে রচিত একটি মিথ্যা হাদীছ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে বিস্তারিত আলোচনার মতো অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও সংক্ষেপে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে মনে হয় যে, যেহেতু মানুষকে আল্লাহর গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিরঙ্কুশ স্বাধীন সেহেতু যে কোনো মানুষের পক্ষেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করতে চাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে বসা অসম্ভব নয়, এমনকি নবী- রাসূলগণের

('আঃ) পক্ষেও নয়। উপরোদ্ধৃত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে যে বলতে বলা হয়েছে "আমার কাছে যা ওয়াহী করা হয়েছে তা ব্যতীত আমি যদি অন্য কিছুর অনুসরণ করি" - এতেই এ সত্য নিহিত রয়েছে যে, তাঁর নাফরমানী করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় নি।

এর সাথে অবশ্য ইছ্বমাত্ (নিষ্পাপত্ব)- এর কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ, নবী- রাসূলগণ ('আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণের ('আঃ) নিষ্পাপত্বের মানে এই নয় যে, তাঁদের মধ্য থেকে গুনাহ্ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। তাহলে তো তাঁরা ফেরেশতা সমতুল্য হয়ে যেতেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের মাধ্যমে আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করা আল্লাহ্ তা'আলার সুবিচারের ছ্বিফাতের বরখেলাফ হতো। তাই তাঁদের ইছ্বমাতের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, তাঁদের মধ্য থেকে নাফরমানীর ক্ষমতা বিলুপ্ত না করা সত্ত্বেও রক্তধারার পবিত্রতা, জন্মের পর থেকেই পূতপবিত্র জীবনের অভ্যস্ততা ও খোদায়ী ওয়াহীর জ্ঞানের কারণে, বিশেষতঃ ইল্মে হুযূরীর কারণে, তাঁরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকেন।

এখানে বিষয়টি অত্যন্ত সূ দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তা হচ্ছে, "মা'ছূম্" একটি পরিভাষা; ওপরে যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে সে অর্থেই নবী- রাসূলগণ ('আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণ ('আঃ) মা'ছূম্ ছিলেন, নচেৎ শব্দটি যদি অক্ষরিকভাবে 'নিষ্পাপ' অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে গুনাহ্ করার ক্ষমতা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকেই জীবদ্দশায় মা'ছূম্ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যদিও নবী- রাসূলগণ ('আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণ ('আঃ) গুনাহ্ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অবস্থার আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাস্তবে তাঁদের পক্ষে গুনাহ্ করার সম্ভাবনা ছিলো এতোই ক্ষীণ যে, তা শতাংশের ভগ্নাংশেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তথাপি যেহেতু তাঁরা এ ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন না সেহেতু প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে তাঁরা অবশ্যই মা'ছূম্ ছিলেন এবং তাঁরা যে বেহেশতে যাবেন এ ব্যাপারে মানুষের পক্ষে সন্দেহ করার বি মাত্র কারণ ছিলো না, বরং নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব ছিলো যে, তাঁরা অবশ্যই বেহেশতে যাবেন এবং বেহেশতবাসীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বেহেশতী হিসেবে অগ্রিম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া সম্ভবপর ছিলো না।

বিষয়টি মানুষের আচরণ থেকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও অনুধাবন করা যেতে পারে। তাঁদের ইছ্মাতের (নিষ্পাপত্বের) দৃষ্টান্ত হচ্ছে অত্যন্ত উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় যিনি চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ফুটপাতে খোলা অবস্থায় বিক্রি করা হয় এমন খাবার খান না। এহেন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থার মুখোমুখি হন যে, ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেখানে খাবার মতো কিছুই নেই এমতাবস্থায় তিনি যদি কোথাও মানুষের মল পেয়ে যান এবং জানেন যে, তাতে পুষ্টি আছে বলেই কুকুর তা খায়, সুতরাং তা খেয়ে জীবন বাঁচানো সম্ভব, তথাপি তিনি তা খেয়ে জীবন বাঁচাবেন এমন সম্ভাবনা বি মাত্রও আছে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে ও আক্ষরিকভাবে তাঁর পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব বলা যাবে না। সুতরাং এ বিষয়টির ওপরে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ বাযী (ধরুন বিলিয়ন ডলারের) ধরবেন না।

আর মানুষের পক্ষ থেকে মা'ছূমগণকে ('আঃ) জীবদ্দশায় বেহেশতী বলে অভিহিত করা ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদেরকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি না দেয়ার উপমা হচ্ছে একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান ছাত্রের ন্যায় যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্র- শিক্ষক ও আশেপাশের লোকদের সকলেই নিশ্চয়তার সাথে জানে যে, বরাবরের মতো আগামী পরীক্ষায়ও সে প্রথম হবে এবং নতুন াসে তার ক্রমিক নম্বর হবে 'এক ' , তাই তারা নিশ্চয়তার সাথে বলে যে, আগামী বছরের াসে সে- ই 'প্রথম ছাত্র ' , তথাপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হবার আগে পরবর্তী বছরের ছাত্রহাযিরা খাতায় তার নাম প্রথম ক্রমিকে তুলে রাখবেন না। কারণ, তা করলে ঐ ছাত্রের পক্ষে আলসেমি বা দুষ্টামি করে হলেও পরীক্ষা দেয়া হতে বিরত থাকা অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের উক্ত কাজ হবে তাঁর পদমর্যাদার অনুপযোগী একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ।

একইভাবে নবী- রাসূলগণ সহ মা'ছূমগণকে ('আঃ) যদি জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হতো তাহলে তাঁদের পক্ষে মানুষের মধ্যে নিহিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার ঐশী গুণের ব্যবহার করে

আল্লাহর নাফরমানী করে বসা অসম্ভব হতো না। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা বরখেলাফ করেন না সেহেতু নাফরমানী করলেও তাঁদেরকে বেহেশতে নিতে হতো। কিন্তু কোনো নবী গুনাহর কাজ করলে বান্দাহ্ দের জন্য খোদায়ী হুজ্জাত পূর্ণ হতো না, কারণ, মুখ্ লিছ্ব লোকদের পক্ষেও এ ধরনের নবীর নবুওয়াতের ব্যাপারে ইয়াক্বীনের অধিকারী হওয়া সম্ভব হতো না। তাই, এ কালের পরিভাষায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো নবীকে াঙ্ক চেক্ দেন নি। তাহলে তা দশজন ছ্বাহাবীকে কী করে দেয়া হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ইসলামের সকল ধারার হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ্ অনুযায়ী নবী করীম (ছ্বাঃ) যে হযরত ফাত্বেমাহ্ (সালামুল্লাহ্ 'আলাইহা)কে 'বেহেশতে নারীদের নেত্রী ' এবং হযরত ইমাম হাসান্ ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)কে 'বেহেশতে যুবকদের নেতা ' বলে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যা কী?

এর ব্যাখ্যাও ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। এটা স্কুলের ছাত্র- শিক্ষক ও আশেপাশের লোকদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার আগেই কোনো ছাত্রকে পরবর্তী াসের 'প্রথম ছাত্র ' হিসেবে উল্লেখ করার ন্যায় আক্ষরিকভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে সত্য, তবে তাতে 'ঠিকভাবে পরীক্ষা দেয়া সাপেক্ষে ' শর্তটি উহ্য থাকে এবং এর মানে এ নয় যে, প্রধান শিক্ষক তার নাম পরীক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই পরবর্তী বছরের ছাত্রহাযিরা খাতায় তুলে রেখেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, আমি হাদীছের বিরোধী নই; যারা নিঃশর্তভাবে সমস্ত হাদীছই প্রত্যাখ্যান করে তাদের বিরুদ্ধে আমি লিখেছি এবং তা পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, প্রচলিত হাদীছগ্রন্থ্ সমূহ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলন করা হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে মুখে মুখে বহু স্তরে একেকটি হাদীছ বর্ণিত হয়ে এরপর সংকলক পর্যন্ত পৌঁছেছে। সংকলকগণ নিজেরাও মিথ্যা হাদীছের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁরা যে সব হাদীছ সংগ্রহ করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে লক্ষ লক্ষ হাদীছকে মিথ্যা, বিকৃত, পরিবর্তিত ও দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের হাদীছসংকলন সমূহে স্থান দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁরা বহু পরীক্ষা- নিরীক্ষা

করে যে সব হাদীছকে ছ্বহীহ্ মনে করে তাঁদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন সে সবের মধ্যেও বহু জাল ও বিকৃত হাদীছ থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা নবী- রাসূল ও খোদায়ী ওয়াহীপ্রাপ্ত ছিলেন না এবং তাঁরা নবী- রাসূলগণের ('আঃ) ন্যায় মা'ছূম্ ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা আমাদের মতোই গুনাহ্ ও ভুলের উর্ধে ছিলেন না যে, তাঁদের কাজ অবশ্যই নির্ভুল হবে।

অন্যদিকে মুসলমান হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর ওপর ঈমান আনা শর্ত, এ ব্যক্তিদের ওপর ঈমান আনা শর্ত নয়। তেমনি যদিও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর দ্বীন ও শরী'আত্ সংশ্লিষ্ট এবং আদর্শিক, শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক যে কোনো কথাই ওয়াহী (মাত্ লূ বা ায়রে মাত্ লূ) হিসেবে মেনে নেয়া যরূরী, কিন্তু তাঁর কথা হিসেবে দাবী করে বলা হয়েছে অন্য লোকদের এ ধরনের যে কোনো কথাকেই তাঁর কথা বলে মেনে নেয়া একটি ভ্রান্ত ও অসতর্ক কর্মনীতি এবং তা দ্বীন ও ঈমানের জন্য খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। তাই খব্ রে ওয়াহেদ অর্থাৎ কোনো না কোনো স্তরে, বিশেষ করে প্রথম দিককার কোনো স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত হাদীছ অবশ্যই কেবল চার অকাট্য দলীল (আক্বল্, কোরআন, মুতাওয়াতি হাদীছ ও প্রথম যুগ থেকে সমগ্র উম্মাহর মতৈক্যভিত্তিক বিষয়াদি)- এর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কেবল গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাক্রূহ্) ও প্রায়োগিক বিষয়াদিতে গ্রহণযোগ্য।

এবার আমরা ছ্বাহাবীদের সংজ্ঞা ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দেবো।

কেউ ঈমানের ঘোষণা সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে এক নযর দেখে থাকলে তিনিই ছ্বাহাবী- বহুলপ্রচলনকৃত এ সংজ্ঞাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হলে বলতে হবে "ছ্বাহাবী" স্রেফ একটি জনগোষ্ঠীর কালিক পরিচয় মাত্র; ছ্বাহাবী হওয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ ফযীলত্ নিহিত নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে এক নযর দেখা এমন কোনো কাজ নয় যা কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ- নিষেধের অনুবর্তিতার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ, ছ্বাহাবীর এ সংজ্ঞা কোরআন মজীদে বা মুতাওয়াতির হাদীছে আসে নি এবং এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মাহর মধ্যে মতৈক্য (ইজমা') ও নেই। আর আক্বল্ ও এটা গ্রহণ করে না। এ সংজ্ঞা আপনার- আমার মতো মানুষের দেয়া যারা ভুল ও স্বার্থের উর্ধে ছিলেন না।

অন্যদিকে ছ্বাহাবী হওয়াকে যদি ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করতে হয় তাহলে এ সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যাত এবং ছ্বাহাবীর সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। সংক্ষেপে তা হচ্ছে, যারা অন্তরে ও মুখে ঈমান এনেছিলেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেন ও ইখলাছ্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে ভালোবাসতেন তাঁকে চাক্ষুষভাবে দর্শনকারী এমন ব্যক্তিগণই ছ্বাহাবী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর সাথে কারো বাহ্যিক সাহচর্য (মা'য়িয়াতে জিস্ মানী)ই কাউকে তাঁর ছ্বাহাবীতে পরিণত করে নি, বরং কেবল তাঁকে চাক্ষুষভাবে দর্শনকারী কোনো ব্যক্তির তাঁর সাথে আত্মিক সাহচর্য (মা'য়িয়াতে রূহানী)ই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর ছ্বাহাবীতে পরিণত করে।

সূরাহ্ আল্- ফাত্ হ্- এর ২৯ নম্বর আয়াতে "ওয়াল্লাযীনা মা'আহু" বলতে দৃশ্যতঃ মা'য়িয়াতে জিস্ মানী বুঝানো হয়েছে বলে তাৎপর্য গ্রহণের সুযোগ আছে বটে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা 'ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেবল তাঁদেরকে যারা তাঁর সাথে মা'য়িয়াতে জিস্ মানী ও মা'য়িয়াতে রূহানী এ উভয় ধরনের সাহচর্য রক্ষা করতেন। কারণ, আয়াতের শেষাংশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে : "তাদের মধ্যকার যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল করেছে তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

এ থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর বাহ্যিক সহচরদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলো দৃশ্যতঃ যারা বর্ণিত সকল গুণের আধার হলেও তাদের অন্তরে ঈমান ছিলো না, বরং তারা কোনো বিশেষ কারণে বা বিশেষ উদ্দেশ্য হাছ্বিলের লক্ষ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো এবং বাহ্যিকভাবে প্রকৃত ছ্বাহাবীদের ন্যায়- যারা আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছিলেন- আমল করতো।

এছাড়াও আয়াতের শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর সহচরদের অন্যতম বশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তারা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল"। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন একাধিক বার এরূপ ঘটেছে যে, তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ও পরস্পরকে হত্যা করেছেন, তখন নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যকার একদল "প্রকৃত ঈমান

পোষণকারী ও যথাযথ আমল সম্পাদনকারী" ছিলো না অর্থাৎ মুনাফিক্ব ছিলো যা- দেরীতে প্রকাশ পায়।

সূরাহ্ আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়াতের দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্গে বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, কোরআন মজীদ এবং তাঁর সূরাহ্ সমূহ ও আয়াত সমূহ থেকে সঠিক অর্থ গ্রহণের জন্য কিছু পূর্বপ্রস্তুতির (মুক্বাদ্দামাত) শর্ত আছে; কেবল তরযমার ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়, এমনকি কেবল আরবী ভাষা জানা থাকাও কোরআন থেকে অর্থ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু কোরআন মজীদ একটি একক পূর্ণাঙ্গ সত্তা তাই এর অংশগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত এবং এর একেকটি অংশ অপর এক বা একাধিক অংশকে ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে, কোরআন মজীদে অনেক আয়াতে "সাধারণ" ('আম্) বক্তব্য পেশ করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে হয়তো তার তাৎপর্যকে সীমিত করা (তাখ্ ছীছ্ব) করা হয়েছে। সূরাহ্ আত্- তাওবাহর ১০০ নম্বর আয়াত্ টি এ ধরনের একটি সাধারণ তথ্য সম্বলিত আয়াত্। এতে সাধারণভাবে মুহাজেরিন ও আন্ ছ্বারদের মধ্যকার অগ্রবর্তীদের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়। কারণ, যে কোনো উত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে। তাছাড়া السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ কতোজন ও কারা ছিলেন সে সম্পর্কে অকাট্য দলীলে, বিশেষতঃ কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত নেই। তাছাড়া হিজরত ও সাহায্যকরণের ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণকারীদের বেলায় بِإِحْسَانٍ শর্ত যোগ করা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রেও তাঁরা ক'জন ও কে কে তা কোনো অকাট্য দলীল থেকে জানা যায় না।

অন্যদিকে কোরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর যুগের যে মুনাফিক্ব দের কথা বলা হয়েছে তাদের সকলেই ছিলো ঈমানের ঘোষণা সহ তাঁকে দর্শনকারী তথা প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবী। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন :

(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ)

“ (হে রাসূল!) মুনাফিক্ রা যখন আপনার কাছে আসবে তখন বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। ” (সূরাহ্ আল্- মুনাফিক্বুন্ : ১) অতএব, তাদের ঈমানের ঘোষণা সহ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুনাফিক্বরা সংখ্যায় ক'জন ছিলো?

প্রণিধানযোগ্য যে, সূরাহ্ আত্- তাওবাহর উক্ত ১০০ নম্বর আয়াতের পরেই অর্থাৎ ১০১ নম্বর আয়াতেই এদের বিরাট সংখ্যার ব্যাপারে আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ)

“ আর তোমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের মধ্যকার আরবদের মধ্যে মুনাফিক্বরা আছে এবং মদীনাহ্ বাসীদের মধ্যেও (মুনাফিক্বরা আছে)- যারা নেফাক্বের ওপরে খুবই কঠোর। (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে (মুনাফিক্ব হিসেবে) চিনেন না, কিন্তু আমি তাদেরকে চিনি। ”

অনেকে অবশ্য أَعْرَابِ- এর মানে করেন (বেদুঈন বা যাযাবর আরব) যদিও أَعْرَابِ হচ্ছে عرب শব্দের বহুবচন এবং أَعْرَبِ মানে বিশুদ্ধ আরব বা বেদুঈন যাযাবর আরব। এমনকি যদি 'বেদুঈন বা যাযাবর আরব ' অর্থকেই সঠিক বলে ধরা হয় তাতেও পার্থক্য হচ্ছে না। কারণ, তারা ঈমানের ঘোষণা প্রদানকারী ছিলো এবং এ কারণে ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত ছিলো। অর্থাৎ মুহাজির ও আন্ ছ্বার নির্বিশেষে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুনাফিক্ব লুকিয়ে ছিলো। আর এই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক্বের মধ্যে কেবল আব্ দুল্লাহ্ ইব্ নে উবাই সহ দু'চার জন ছাড়া অকাট্যভাবে আর কাউকেই মুনাফিক্ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নি এবং এদের সকলেই ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত।

এছাড়া ম াহ্ বিজয়ের দিনে যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন নি (সূরাহ্ আস্- সাজদাহ্ : ২৮- ২৯)। কিন্তু তারাও ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

সুতরাং ছ্বাহাবীর প্রচলিত সংজ্ঞাকে মানলে ছ্বাহাবী হওয়াকে কোনো ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করা চলে না। অতএব, তাঁদের কাজকর্ম বিচার করে তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থা সম্বন্ধে আলাদা

আলাদা ভাবে ধারণা নিতে হবে। আর ছ্বাহাবী হওয়াকে ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করতে হলে ছ্বাহাবীর সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে এবং তৎকালীন লোকদের আমল বিচার করে কে ছ্বাহাবী ও কে নয় তা নির্ধারণ করতে হবে।

মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে ঈমান

সূরাহ্ আস্- সাজদাহর ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের ভিত্তিতে 'ম াহ্ বিজয়ের দিনে যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন নি ' - এ অভিমতের সাথে অনেকের দ্বিমত আছে, বিশেষ করে এ কারণে যে, কোনো কোনো তাফসীরে ও রেওয়াইয়াতে ২৯ নং আয়াতের يَوْمَ الْفَتْحِ কথাটির অর্থ করা হয়েছে 'ফয়ছ্বালার দিন ' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। তাই এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে এরশাদ হয়েছে :

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ)

" আর তারা বলে: এ বিজয় কখন (আসবে) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? (হে রাসূল!) বলুন, বিজয়ের দিনে কাফেরদের ঈমান তাদেরকে কোনো কল্যাণ দেবে না। "

কোরআন মজীদ প্রধানতঃ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফাছ্বাহাত্- বালা াতের কারণে মু ' জিযাহ্। আর ফাছ্বীহ্ ও বালী বক্তার বশিষ্ট্য হচ্ছে, যে কথা ও শব্দ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝাবার জন্য সর্বাধিক উপযোগী তা- ই তিনি ব্যবহার করবেন। অন্যদিকে বহু অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অর্থ বুঝাবার নিদর্শন না থাকলে বহুল প্রচলিত অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে।

" ফয়ছ্বালা " শব্দটিও আরবী এবং কোরআন মজীদে শেষ বিচারের দিন বুঝাতে বেশ কয়েক জায়গায় يوم الفصل ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে (সূরাহ্ আস্- সাজদাহ্: ২৮- ২৯) আল্লাহ্ তা'আলা "ফয়ছ্বালার দিন " বুঝাতে চাইলে ফাছ্বাহাত্- বালা াতের দাবী অনুযায়ী يوم الفصل ব্যবহার করতেন।

অন্যদিকে “ঈমান আনয়ন” কথাটি শেষ বিচারের দিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে, মনে করতে হবে, তারা সেখানে ঈমান আনবে, কিন্তু তা কাজে লাগবে না। আর যদি দুনিয়ার বুকে ঈমান আনে এবং আল্লাহর কাছে তাদের ঈমান আনয়ন কবূল হয় তো শেষ বিচারের দিনে “কাফেরদের ঈমান কল্যাণ দেবে না” উল্লেখ করার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং এর মানে একটাই যে, যে সব কাফের (ম াহ্-)বিজয়ের দিনে নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান প্রকৃত ঈমান নয় এবং এ কারণে তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবূল হয় নি। আর ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরনের লোকেরা ইসলামী উম্মাহর জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিলো এবং তা যে তাদের নেফাক্বের কারণে হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।

মা'ছূমগণের ('আঃ) প্রশ্নে ইত্ মামে হুজ্জাত্ বনাম নেফাক্ব্

এখানে বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা যরূরী মনে করছি। এটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত রাসূলের আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় ঈমানের ঘোষণা প্রদানকারী কোনো কোনো লোক তাঁর কোনো কোনো কথা বা সিদ্ধান্তকে 'সঠিক নয়' বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন। অন্যদিকে এ- ও অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন মুসলমানদের বেশীর ভাগই প্রথমেই আহ্ লে বাইতের ('আঃ) অন্যতম মা'ছূম ব্যক্তিত্ব হযরত 'আলী (আঃ)- এর নেতৃত্ব মেনে নেন নি এবং কেউ কেউ তাঁদের সাথে শত্রুতা- বিদ্বেষের পরিচয় দেয়, এমনকি আরো পরে কতক লোক তাঁদের ওপর যুলুম- নির্যাতন চালায় ও তাঁদের অনেককে হত্যা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, এরা কি মুসলমান ছিলো, নাকি মুনাফিক্ব ছিলো?

এ ব্যাপারে সংক্ষেপে বলতে হয় যে, বিষয়টি ইত্ মামে হুজ্জাত্ ও সতর্কতার নীতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে। (ইত্ মামে হুজ্জাত্ ও সতর্কতার নীতি সম্পর্কে আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।) তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইখ্ লাছ্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী বা ইমামের ('আঃ) পরিচয় ইয়াক্বীন্ সৃষ্টিকারী পর্যায়ে অকাট্যভাবে লাভ না করার কারণে তাঁকে নবী বা ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে নি এ জন্য তাকে

পাকড়াও হতে হবে না, বরং তাওহীদ ও আখেরাতে ঈমান এবং আমলে ছ্বালেহর কারণে এমন ব্যক্তি নাজাত্ লাভ করবেন, তবে এরূপ ব্যক্তি ইখ্ লাছের অধিকারী হলে অন্ততঃ পূতচরিত্র ব্যক্তি হিসেবে নবী বা ইমামের ('আঃ) সরাসরি বিরোধিতা করা হতে বিরত থাকবেন। অন্যথায় অবশ্যই তাকে পাকড়াও হতে হবে।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের আচরণকে এর আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ মা'ছূম্ ইমামের ('আঃ) মা'ছূম্ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হবার ব্যাপারে যাদের জন্য ইত্ মামে হুজ্জাত্ না হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রহণ করেন নি কিন্তু তাঁর সহ আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় নেন নি তাঁদেরকে কিছুতেই মুনাফিক্ব্ বলা যাবে না। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তাঁদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে ইত্ মামে হুজ্জাত্ হওয়া সত্ত্বেও কোনো পার্থিব স্বার্থে সুবিধাবাদী নীতির কারণে তাঁদেরকে স্বীকার করা হতে বিরত থেকে থাকে, কিন্তু প্রকাশ্য বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় না নিয়ে থাকে তো এ ধরনের লোকদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার ওপরে সোপর্দ; কারণ, অন্তরের খবর কেবল তিনিই রাখেন।

সুতরাং কেবল আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকার জন্যই কাউকে মুনাফিক্ব বলে গণ্য করা যাবে না, যদি না সরাসরি তাঁদের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় না নিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, অনেক লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বিপরীতে, তাঁদের মধ্যে এমন একটি বিরাট সংখ্যক লোক ছিলেন যাদের কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছিলো খুবই সীমিত কারণ, তখন লেখাপড়ার প্রচলন ছিলো খুবই অল্প এবং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় যাদের হাতে পুরো কোরআন মজীদের কপি ছিলো বা যারা পুরো কোরআন মজীদ মুখস্ত করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা তৎকালীন মোট মুসলমান-সংখ্যার তুলনায় শতকরা হারের দৃষ্টিতে দেখলে এক

শতাংশেরও ভগ্নাংশ ছিলো। শুধু তা- ই নয়, অনেকের ঈমান ছিলো খুবই দুর্বল ও ভাসাভাসা। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا)

" আরবগণ বলে : আমরা ঈমান এনেছি। (হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমরা এখনো ঈমান আনয়ন করো নি, বরং তোমরা বলো যে. আমরা আত্মসমর্পণ করেছি (মুসলমান হয়েছি), কিন্তু এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি। তবে তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের আমল সমূহ থেকে কিছুই নি ল হবে না। " (সূরাহ্ আল্- হুজুরাত্ : ১৪)

অনেকে অবশ্য উপরোক্ত আয়াতের الأَعْرَابُ শব্দের অর্থ করেছেন 'মরুবাসীগণ ' বা 'বেদুঈন আরবগণ ' । যদিও এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়, কারণ, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, اعْرَابُ হচ্ছে عرب শব্দের বহুবচন, সুতরাং এতে মদীনাহর বাইরের শহর ও মরু নির্বিশেষে সকল এলাকার আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সকলেই নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক। এমতাবস্থায় এ ধরনের যে সব লোকের ব্যাপারে আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর সাথে সরাসরি বিরোধিতা বা শত্রুতা- বিদ্বেষের অকাট্য প্রমাণ নেই তাদেরকে মুনাফিক্ব্ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, যদিও সূরাহ্ আত্- তাওবাহর ১০১ নং আয়াত্ অনুযায়ী এদের মধ্যেও বহু মুনাফিক্ব্ ছিলো।

সূচীপত্র

ভূমিকা 4

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ 9

আলোচনার মানদণ্ড 9

কোরআন মজীদে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত ও বিবিগণ 11

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত কারা? 21

ইসলামে আহলে বাইত- এর মর্যাদা 30

হযরত আলীর (আঃ) ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব 31

হযরত ফাতেমাহ্ ও হাসান- হোসেন (আঃ)- এর মর্যাদা 33

নামাযের দরূদে আলে মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) মর্যাদা 34

কোরআন মজীদে ইমামত 36

গাদীরে খূমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ঘোষণা 45

দ্বীনী শাসক জনগণ কর্তৃক নির্বাচিতব্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত. 48

দ্বীনী নেতৃত্বের তিনটি গুণ- বশিষ্ট্য. 50

ছাহাবীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে 51

আহলে বাইত (আঃ)ই ছিলেন শাসনকর্তৃত্বের হক্বদার 54

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর. 55

আদর্শিক ও বংশগত উত্তরাধিকারের অভিন্নতা প্রসঙ্গে 64

ইমামত কেবল ইমাম হোসেনের (আঃ) বংশধারায় কেন. 68

পাপমুক্ততা ও এখিতয়ার- এর সম য় কীভাবে 74

ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও ানো কেন 85

হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) আন্দোলনের তাৎপর্য. 103
কারবালার চেতনা কি বিলুপ্তির পথে? 112
কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহ্‌র (ছ্বাঃ) যুগের মুনাফিক্ব্. 118
সূচীপত্র. 132